দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চালাচ্ছেন মমতা
পৃ—১০

বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকবেন ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে
পৃ—২৩

৭৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ।। ১০ আশ্বিন - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

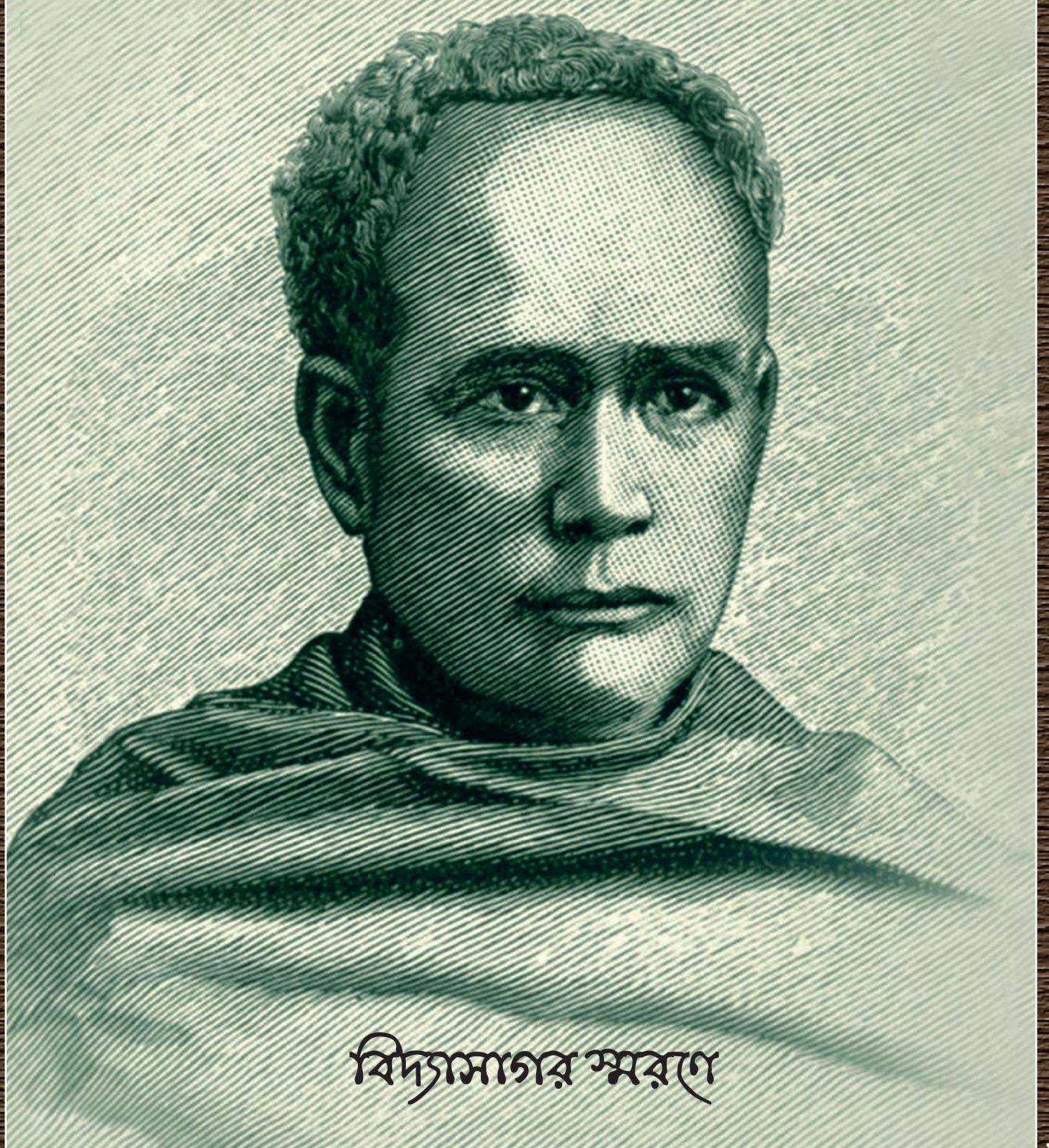

বিদ্যাসাগর স্মরণে

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ১০ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৭ সেপ্টেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

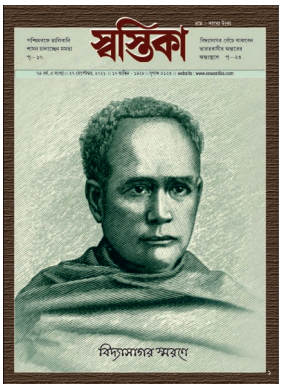

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

তৃণমূল কংগ্রেস 'পুনর্বাসন দপ্তর'—২০২৪-এ কাকে টক্কর মমতার □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

পয়সা উশুল এবং তৃণমূল □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস এখনও অটুট □ প্রকাশ জাভড়েকর □ ৮

পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চালাচ্ছেন মমতা □ সাধন কুমার পাল □ ১০

ঔরঙ্গজেবের অপকীর্তি বামপন্থীরা চাপা দিতে চান □ অমলেশ মিশ্র □ ১৩

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুরা সংকটে □ ধীরেন দেবনাথ □ ১৫

এক সন্ন্যাসী এবং এক মারাঠি তরুণ □ সূর্যশেখর হালদার □ ১৭

বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকবেন ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ২৩

ছোটোখাটো মানুষটির হাত ধরে জোয়ার এসেছিল □ নিখিল চিত্রকর □ ২৭

নিজের উদ্যোগে ষাটজন বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন □ ড. অঞ্জনা পায়ড়া □ ২৯

ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রদূত রাসবিহারী বসু □ রাজদীপ মিশ্র □ ৩১

রামায়ণ সংস্কৃত থেকে নেপালি ভাষাতে অনুবাদ করেন কবিরত্ন ভানুভক্ত □ কৌশিক রায় □ ৩৩

ভারতীয় কৃষকের আরাধ্য দেবতা বলরাম □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৪

কেবল 'বিজেপি ঠেকাও' ইস্যুতে মোদীর হাতই বেশি শক্ত হচ্ছে □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৫

সিউড়িতে ঐতিহাসিক শ্রীরাধিকা বিগ্রহের সেবাপূজা □ নিজস্ব সংবাদদাতা □ ৩৯

কল্যাণ সিংহ ছিলেন কল্যাণপথের পথিক □ বিনোদ বনসল □ ৪৩

জেরুজালেম তুমি কার ? □ সুভাষ মোহান্ত □ ৪৫

জঙ্গি গ্রেপ্তার : সতর্কতা দরকার সর্বস্তরে □ বিশ্বামিত্র □ ৪৭

সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কিত গবেষণায় কে.ডি. শেঠনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **সমাবেশ সমাচার : ৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা** □ **৫০**

প্রকাশিত হবে
৪ অক্টোবর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ অক্টোবর
২০২১

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪২৮। উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে এবং ভ্রমণ কাহিনিতে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি। লিখেছেন— প্রবাল চক্রবর্তী, শেখর সেনগুপ্ত, রমানাথ রায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম মাত্র ৫০ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

সম্পাদকীয়

সর্বকালের সেরা বাঙ্গালি

বাঙ্গলার নব জাগরণের পুরোধাপুরুষদের অন্যতম হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ন্যায় সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণ এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়া তিনি বাঙ্গালি জাতির অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করিলে দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনপন্থী সমাজপতিদের কাছে তিনি যেমন বজ্রসদৃশ কঠোর ছিলেন, তেমনই কাহারও দুঃখে তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িতেন। বিশেষ করিয়া বাল্যবিধবাদের মলিন মুখ তাঁহাকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিত। তাঁহার হৃদয়খানি পুষ্পের ন্যায় কোমল ছিল। কবি মধুসূদন দত্ত তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজদের কর্মোদ্যম এবং বাঙ্গালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি যেমন ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার পথিকৃৎ ছিলেন, তেমনই বাংলাভাষা সংস্কারেরও অগ্রদূত ছিলেন। তাই তাঁহাকে বাংলা সহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিক্ষাবিদ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, 'বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনওটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া সাহিত্যে ও সংসারকার্যের সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইলেন।'

ইদানীংকালে বঙ্গ রাজনীতিতে বাঙ্গালি ও বাঙ্গালিয়ানা শব্দ দুইটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হইয়াছে। কে সেরা বাঙ্গালি তাহা লইয়া প্রতিযাগিতারও আয়োজন চলিতেছে। ইহা বহু পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর হইলেন সর্বযুগের, সর্বকালের খাঁটি, শ্রেষ্ঠ ও সেরা বাঙ্গালি। ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গালি যখন খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদে ইংরেজদিগের অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ও তিনি স্বাদেশিকতা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার স্বাভিমান ও স্বাজাত্যবোধ ছিল অতুলনীয়।

তথাকথিত সেকুলার ঐতিহাসিকরা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁর নিকট জীবন্ত দেবতার সেবাই ছিল ঈশ্বর সেবা। দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষদের তিনি দরিদ্রনারায়ণ মনে করিতেন। পিতা-মাতাকে তিনি চলমান ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের মাথায় এই কথাগুলি প্রবেশ করে না কোনওকালে। তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না যে, বিদ্যাসাগর অন্যায়ের বেদনায় প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিলেন, হিন্দুধর্মের উপর নয়। মধ্যযুগে বিদেশি ও বিধর্মী শাসকদের অত্যাচারের জর্জরিত তৎকালীন সমাজ যে কূপমণ্ডুকতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর সেই অচলায়তন থেকে সমাজকে মুক্তি দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করিয়া বলশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই নবীনতাই আমার নিকট সবচাইতে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলিবার পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।' তাই বিদ্যাসাগর স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সর্বযুগে সর্বকালে তিনি বাঙ্গালি জাতির নমস্য হইয়া থাকিবেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সেরা বাঙ্গালি বলিয়া যদি কাহাকেও সম্মানিত করিতেই হয় তিনি নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন, 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ওই গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থানে বিদ্যাসাগরের মূর্তি শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে। কাহারও সাধ্য নাই যে সেই চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।'

সুভাষিতম্

পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিবাদিনম্।
বর্জয়েৎ তাদৃশম্ মিত্রং বিষকুম্ভংপয়োমুখম্।। (চাণক্যনীতি)

পিছন থেকে কাজ পণ্ড করে এবং সামনে মধুর বাক্য বলে— এরকম মিত্র মুখে মধু থাকা বিষকুম্ভের মতো।

তৃণমূল কংগ্রেস ‘পুর্নবাসন দপ্তর’ ২০২৪-এ কাকে টক্কর মমতার ?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিনকে টক্কর দিতে পারবেন? অবশ্য বিজেপিকে যদি মোদী বিরোধী ২৪ পার্টির জোট হারাতে পারে তবেই তা ভাবা যেতে পারে। তার প্রস্তুতি চলছে। মমতা তার নেতা। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়াও নেতা। আবার স্ট্যালিনও নেতা। রাজ্য ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে ‘ওয়াশিং মেশিন’ বলেছিলেন। বিভিন্ন রকমের কেন্দ্রীয় তদন্ত থেকে পিঠ বাঁচাতে অনেক তৃণমূল নেতা সেই সময় বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁর নিজের দল এখন কার্যত ‘পুর্নবাসন দপ্তরে’ পরিণত হয়েছে। আর এটা তিনি স্বেচ্ছায় করেছেন। চাইলে নাও করতে পারতেন। ভোটে হেরে যাওয়া বাতিল নেতাদের নিয়ে তিনি ঘর ভরছেন।

রাজনৈতিক ভাবে এটা পরিষ্কার যে, ২০২৪-এর লোকসভা ভোট পর্যন্ত মমতা তাঁর এই সুচারু খেলাটা খেলবেন। আর খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য বিজেপির পক্ষে এই খেলায় এঁটে ওঠা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যদি না কোনো ‘ম্যাজিক’ কাজ করে। বিজেপিতে এখন তৃণমূল থেকে ভাড়া করা সৈনিক বেশি। রাজ্য ভোটে বিজেপির ২৯৩ প্রার্থীর মধ্যে ১৫৮ জন তৃণমূল ছেড়ে এসেছিলেন।

মমতার লক্ষ্য একটাই। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে কমে যাওয়া আসনকে ৪০-৪২-এর ঘরে নিয়ে যাওয়া। ২০২৪-এর আগেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেওয়া। বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর মুখ হয়ে উঠতে গেলে লোকসভা ভোটে তাঁকে অন্তত ৩৫ থেকে ৩৯টি আসন পেতে হবে। এই মুহূর্তে তিনি ২২ আসনের নেত্রী। না হলে ডিএমকে নেতা স্ট্যালিন বাজিমাত করে দেবেন।

লোকসভায় তৃণমূলের আসন সংখ্যা ২২। ডিএমকে-র ৩৮। বলাই বাহুল্য যে স্ট্যালিন মমতার থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। ফলে মমতার লড়াই কঠিন। বিজেপির বিরুদ্ধে তো বটেই। মোদী বিরোধী বা বিজেপি বিরোধী গোষ্ঠীতে তা আরও বেশি। গোদের ওপর বিষফোঁড়া কংগ্রেস। ১৯৯৮-এ তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই মমতার সমস্যা কংগ্রেস। তাই জন্মেই তৃণমূল বিজেপির হাত ধরেছিল। পরে আসে কংগ্রেস। অনেকটা বাধ্য হয়ে তাঁর সাংসদ ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিদান হেঁকেছেন। তবে ‘অভিষেক-নিদানের’ মাঝে ঝাঁকের কইরা ঝাঁকে মিশছে।

যুব সুপ্রিমো অভিষেক নিদান হেঁকেছেন ‘বিজেপি থেকে যে সমস্ত বিধায়ক বা সাংসদ তৃণমূলে আসবেন তাঁদের আবার নতুন করে জিতে আসতে হবে’। অন্যথা ‘নো এন্ট্রি বা প্রবেশ নিষেধ’। বিজেপি ছেড়ে মুকুল রায় তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন। দল বিরোধী আইনের ফাঁকে পড়ার ভয় এখনও বিজেপি বিধায়কের পদ তিনি ছাড়েননি। হাওড়া, হুগলির কিছু তৃণমূল নেতা তীর্থের কাকের মতন বসে রয়েছেন। এর মধ্যে দু’বারের বিজেপি সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর হেরো বিধায়ক— বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে তৃণমূল তাঁকে আসানসোল থেকে নতুন করে জিতিয়ে নিয়ে আসবে, নয়তো কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে মেয়র করবে বা রাজ্যসভায় পাঠাবে। বাবুল জানিয়েছেন তিনি আর বিজেপি সাংসদ থাকবেন না। মমতা তাঁকে ‘সুবর্ণ সুযোগ’ দিয়েছেন। রহস্যজনক ভাবে কী সে সুযোগ তা বাবুল বলেননি। তিনি এক হাস্যকর যুক্তি খাড়া করেছেন। তা হলো— তিনি রাজ্যের জন্য কাজ করতে চান। আর তা তৃণমূল হয়েই করতে চান।

অর্থাৎ ২০১৪ থেকে তিনি আসানসোলের মানুষকে বোকা বানিয়েছেন। তাঁর এলাকার জন্য কোনও কাজ করেননি। এবার তৃণমূল হয়ে তা করবেন। ৭ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব খুইয়ে তিনি ৩১ জুলাই রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। দু’মাস বাদে অভিষেকবাবু আর সাংসদ ডেরেক-ও-ব্রায়ানের হাত ধরে তিনি সেই সন্ন্যাস ভেঙেছেন। অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর ভুল হয়েছিল। তিনি তাঁর কথা ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ‘আর নয় অন্যায়’ স্লোগান তুলে নানা ধরনের গান বেঁধেছিলেন আর মাত্রাহীন বিষোদ্‌গার করেছিলেন। এখন ‘মমতা’ নামক সেই অন্যায়ের কোলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জন্মলগ্ন থেকেই তিনি নাকি বিজেপি। ২০১৪-তে বিজেপি দলে তাঁর রাজনৈতিক হাতে খড়ি। সাত বছরের মধ্যে সে খড়ি ভেঙে গিয়েছে। পরিণত হয়েছে ঝালমুড়িতে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মমতার সঙ্গে তাঁর ঝালমুড়ি পলিটিক্স সবাই জানেন। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছায়াসঙ্গী হয়ে কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা সবাই জানেন।

প্রশ্ন উঠছে ‘মমতা কি নিজে রাজনৈতিক সুযোগ খুঁজছেন? আর তাই কি বাবুল-মুকুলের মতন সুযোগ-সন্ধানীদের দলে জায়গা করে দিচ্ছেন?’ আগামীতে তা বোঝা যাবে।

পয়সা উসুল এবং তৃণমূল

মাননীয় বাবুলবাবু,

যে সকালে বসে এই চিঠি লিখছি তার ঠিক আগের সন্ধ্যা বিজেপিতে বড়ো রদবদল এসেছে। রাজ্যে বড়ো সাফল্য দেখানোর পরে দিলীপ ঘোষের উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্বে এসেছেন সুকান্ত মজুমদার। গায়কদাদা, আপনি কি হলফ করে বলতে পারবেন আপনি কোনও উত্তরসূরি রেখে যেতে পেরেছেন? মন্ত্রিত্ব যেতেই আপনি যে ভাবে কেঁদেছেন সেটা বাচ্চা ছেলের হাত থেকে চকোলেট কেড়ে নেওয়ার শামিল মনে হয়েছে। আপনি কি শিশু বাবুল? নাকি লোভী? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব হারানোর পরে এবার কি আপনি রাজ্যের মন্ত্রী হতে চলেছেন বাবুল? না কি রাজ্যসভায় অর্পিতা ঘোষের ইস্তফায় তৈরি হওয়া শূন্যস্থান পূরণ করবে? আপনি ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে ভালোবাসেন। কাজ করতে চান এমন দুর্নাম কেউ করতে পারবে না। সম্প্রতি রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছেড়েছেন তৃণমূলের অর্পিতা ঘোষ। ২০২০ সালে সাংসদ হওয়া অর্পিতার সাংসদপদের মেয়াদ রয়েছে ২০২৬ পর্যন্ত। অর্পিতার ইস্তফার পরে একদিন যেতে না যেতেই আপনার তৃণমূল গমনে তাই নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। কারণ, তৃণমূল সূত্রেই জানা গিয়েছিল, অর্পিতার জায়গায় কোনও 'চমক' দেওয়ার ভাবনা রয়েছে দলের। চমক! সবাই বলছে বটে, কিন্তু আমি মনে করি চক চক করলেই চমক হয় না। অন্তত রাজনীতিতে। মাটির গন্ধ লাগে।

কিন্তু আপনি তো সাংসদ ছিলেনই। লোকসভার পরে রাজ্যসভায় যাওয়ার বান্দা আপনি নন। আপনি বলেছেন, 'এমন সুযোগ আসবে আমি ভাবতেও পারিনি। যা ঘটার সবটাই ঘটেছে গত তিন-চার দিনে। আমি খুবই উত্তেজিত।' একই সঙ্গে বললেন, 'রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলার মানুষের জন্য কাজ করার এত বড়ো সুযোগ ছাড়তে পারিনি।'

বাবুলের এই 'বাঙ্গলার মানুষের জন্য কাজ করার এত বড়ো সুযোগ' বাক্যবন্ধ থেকেই তৈরি হয়েছে আসল সম্ভাবনা। আমি ঠিকই ভেবেছি। তবে কি তিনি এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার সদস্য হতে চলেছেন?

বাবুল আপনি বেশ হিসেবি। রাজ্যে অন্তত দু'জন মন্ত্রী বদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েই রয়েছে। প্রথম অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। তিনি বিধায়ক নন। আর রাজ্যে ভবানীপুর ছাড়া অন্য কোথাও উপনির্বাচন হচ্ছে না। ফলে ছ' মাসের মধ্যে অমিতকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তেই হবে। আবার কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুরের বিধায়ক পদ ছেড়েছেন খড়দহ উপনির্বাচনে প্রার্থী হবেন বলে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন খড়দহে ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি। অন্যদিকে, গুরুতর অসুস্থ রাজ্যের ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী তথা মানিকতলার বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। সুতরাং, তিনি মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবেন কী না, পারলেও কবে পারবেন, তা অনিশ্চিত। শরীর অন্তরায় হলে সাধন মন্ত্রিত্ব এবং বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ওই আসনে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

বাবুল, আপনার সাত বছরে বদভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেটা বিজেপি করে দিয়েছে। মন্ত্রিত্ব ছাড়া আপনি যেন জলছাড়া মাছ। রাজ্যের মন্ত্রিত্বের আশাতেই আপনি দল বদলালেন। রাজনীতি যে 'সম্ভাবনার শিল্প' তা ইদানীংকালে বারবার বুঝিয়েছেন আপনি। সাম্প্রতিককালে আপনার রাজনৈতিক জীবনে দু'টি তারিখ উল্লেখযোগ্য। ৩১ জুলাই এবং ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রথমটি রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা। আর পরেরটি তৃণমূলে যোগদানের দিন। দু'টি তারিখের তফাত গুনে গুনে ৫০ দিন। মাঝের সময়ে নানা সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছেন গায়ক- অভিনেতা-সাংসদ বাবুল আপনি। প্রথমে বলেছিলেন রাজনীতি ছাড়ছেন। পরের বক্তব্য ছিল, বিজেপির সাংসদ পদও ছাড়বেন। এরপরে ক্রমান্বয়ে সাংসদ থেকে গিয়ে রাজনীতি ছাড়ার কথা এবং রাজনীতি না করে মানুষের জন্য কাজ করার শপথ নেওয়ার কথা লিখেছেন আপনি। তার পর ঘুরে ফিরে আবার আপনি সেই রাজনীতিতেই।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে রাজনীতিতে যোগ বাবুলের। আপনার হয়ে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসানসোলের ভোটারদের কাছে বলেছিলেন, 'হামে বাবুল চাহিয়ে।' 'মোদীর কথা শুনেছিল আসানসোল। আপনার কথা নয়। ৭০ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলের শ্রমিকনেত্রী দোলা সেনকে হারায় বিজেপি। এর পরে আপনার মন্ত্রিত্ব। পাঁচ বছর পরে আরও ভালো ফল হয় আসানসোল কেন্দ্রে। ২০১৯ সালে বাবুল তৃণমূলের মুনমুন সেনকে হারিয়ে দেন প্রায় দু' লক্ষ ভোটে।

দু'বারই জয়ের পর মন্ত্রী হয়েছেন। দু'বারই অবশ্য প্রতিমন্ত্রী। প্রথমবার কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এর পরে ২০১৬ সালে দপ্তর বদলে হয় ভারী শিল্প এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প। ২০১৯ সালে সাংসদ হওয়ার পরে বাবুল তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন)-এর মন্ত্রী হন। কিন্তু গত ৭ জুলাই মন্ত্রিসভার রদবদলে বাদ পড়েন বাবুল। এখন দেখার, নাকের (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব) বদলে নরুণ (রাজ্যের মন্ত্রিত্ব) জোটে কী না বাবুলের ভাগ্যে। আসলে কী জানেন আপনাকে সবাই হাফ প্যান্ট মন্ত্রী বলত। সেই হাফ প্যান্টটাও যখন খুলে নেওয়া হলো আপনি উলঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। □

অতিথি কলম

প্রকাশ জাভড়েকর

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস এখনও অটুট

আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান তাঁকে তুমুলভাবে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকটি মন্ত্রীসভার বৈঠকে তিনি মন্ত্রীদের কাছ থেকে তাদের মতামত শোনেন এবং যুক্তিগ্রাহ্য পয়েন্ট থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পুনর্বিবেচনার জন্য বৈঠক পিছিয়ে দেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে তবেই বিল পুনরায় পেশ করা হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর অতিক্রান্ত হয়ে গেল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১তম জন্মদিবস। এই সূত্রে ৬ অক্টোবর ২০২১ সালে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশাসনের শীর্ষে থাকার অবিসংবাদিত রেকর্ড স্পর্শ করবেন। তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৩ বছর। এরপর বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের কর্ণধার হিসেবে রয়েছেন বিগত ৭ বছর। ক্রমান্বয়ে ১৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী ও ৭ বছর জনগণ নির্বাচিত সরকারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী থাকা নেহাতই ভাগ্যক্রমে হয়নি। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর দূরদৃষ্টি ও দেশ পরিচালনায় সন্দেহাতীত দক্ষতার প্রতি জনতার আস্থা অর্পণের কারণেই। মানুষ দেখেছে তিনি গতানুগতিকতার বাইরে চিন্তা করতে পারেন ও তাকে বাস্তবে রূপও দিতে পারেন।

দেশের মানুষ নির্দ্বিধায় এমন একজন নেতার হাতেই ক্ষমতা তুলে দেয় যাঁকে তারা বিশ্বাস করেন যে ইনিই পারবেন এই বিশাল দেশের সমস্যার সমাধান করতে। ভারতীয়রা দীর্ঘদিন দেখেছে পরিবার পরিচালিত সরকার কেমন চরিত্রের হয়। এই একজন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন যিনি গোটা দেশকেই তাঁর পরিবার মনে করেন এবং অক্লান্তভাবে সেই পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দেশের নাগরিকরা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছেন কীভাবে পূর্ববর্তী সরকারগুলির কাজকর্ম স্বার্থান্ধতার কারণে নষ্ট হয়ে যেত। এর উলটো দিকে তারা দেখছে মোদীর কাছে দেশই প্রথম। তাঁর সততা ও নিষ্ঠা নিখাদ ও তুলনারহিত। সকলে দেখছেন তিনি একটি দুর্নীতিমুক্ত সরকার চালিয়ে আসছেন যাতে স্বচ্ছতা আনতে তিনি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করেছেন।

ভারতের নাগরিকরা যে তাঁর ওপর এতটা নির্ভরশীল তাঁর অন্যতম কারণ এটি। একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের মনের গভীরে দেশের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ধারণা কী তা একটা অত্যন্ত নির্ণায়ক বিষয়। বিশ্বের যেখানে যত প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা যাচাই সংক্রান্ত ভোট ও বিশ্লেষণ হয়েছে— সেখানে মোদী সর্বদাই অতি উচ্চস্থানে থেকেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্পর্কে মানুষের মতামত কী তা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। রাজস্থানের বারমেড় অঞ্চলের একটি তরুণ আমাকে বলেছিল, 'আমরা বহুবার দেখেছি আমাদের সৈন্যদের মৃতদেহ পাক সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এই প্রথম আমরা একজন এমন প্রধানমন্ত্রী দেখলাম যিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিমানবাহিনীর একজন বন্দি পাইলটকে অক্ষত অবস্থায় দেশে ফেরত নিয়ে এলেন। একজন মহিলা চাষি জানিয়েছিলেন মোদী নিতান্ত সাধারণ একটি পরিবার থেকে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি হাড়ে হাড়ে বোঝেন দারিদ্র্য কী। এই সূত্রে ৩ টাকা কেজি দরে আমজনতাকে চাল সরবরাহের নীতিতে মণিপুরের মানুষ তাঁর ওপর অত্যন্ত খুশি। বিশেষ করে দেশব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে তা দেশবাসীকে সামাজিক নিশ্চয়তা দিয়েছে।

মোদীর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গরিবের ক্ষমতায়ন। এর মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তরাই প্রধান্য পেয়েছেন। এদের উন্নতি হলেই দ্রুত দেশ এগিয়ে যাবে। এটি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এই পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত করতে ২ কোটি বাড়ি নির্মাণ, ১২ কোটি শৌচাগার, ৪ কোটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ, ৪ কোটি বাড়িতে কলের জল সরবরাহ করা কয়েকটি প্রমাণ মাত্র, যার মাত্রা ও প্রভাব দেশবাসীর ওপর বিশাল। ৫০ কোটি নাগরিককে পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান ভারতের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ২৪ কোটি যুবক-যুবতীকে দেওয়া মুদ্রা ঋণ ও অন্যান্য জীবিকা সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলি বাস্তবে দেশের গরিবদের ভাগ্য ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখে হাসিও ফুটিয়েছে। সমাজের এই অবহেলিত অংশ আজ সম্মানিত বোধ করছে। মধ্যবিত্ত সমাজ সর্বদা শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশী। পূর্ববর্তী ইউপিএ শাসনের সময় দেশের মুম্বাই, আমেদাবাদ, রাজধানী দিল্লি, বারাণসী প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ শহরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় অজস্র মানুষের মৃত্যু ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হয়েছিল। সকলেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন বিগত সাত বছরে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সন্ত্রাসবাদী ও মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যুগপৎ কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে।

মনে রাখা দরকার, উরিতে সামরিক ছাউনিতে ঢুকে পাকিস্তানি হামলা এবং পুলওয়ামায় আমাদের সেনার গাড়ির ওপর সন্ত্রাসী বিস্ফোরণের প্রত্যুত্তরে মোদীজীর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটে বায়ুসেনার আক্রমণে সন্ত্রাসী ঘাঁটি নির্মূল করে দেওয়ার পর বিশ্বে ভারত সম্পর্কে ধারণাই পালটে গেছে। বিশ্বকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন দেশের জন্য তিনি যে কোনো ধরনের রাষ্ট্রসেবামূলক ভূমিকা নিতে পারেন। এরপর দশকের পর দশক ধরে বিতর্কিত জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারার বিলুপ্তিতে দুর্জয় সাহস তিনি দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে এই সময়কালে কোনো হই-হল্লা ছাড়াই আদালতের রায়ে দীর্ঘদিনের রামমন্দির

ইস্যুটিরও শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে। বহু মুসলমান মহিলা বিশ্রী 'তিন তালাক' প্রথা বিলোপ হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবসময়ই চায় এবং যেটা খুবই যুক্তিপূর্ণ যে দেশ পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্রে উন্নতি করুক— যাতে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসর বাড়ে। জাতীয় সড়ক, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জলপরিবহণ, গ্রামীণ পথ নির্মাণ, উড়ানের মতো প্রকল্প রূপায়ণ, মোবাইল তৈরি করা ও ব্যবহার বৃদ্ধি, সস্তায় ডাটা পাওয়া, আয়করের রিফান্ড প্রাপ্য হলে দ্রুত নিষ্পত্তি করে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেশের মানুষের সুখসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার তিনি প্রয়াস নিয়েছেন। অন্যদিকে জিএসটি ও ইসলভেন্সি ও ব্যাংকরাপসি কোড চালু করে তিনি অসাধু ব্যবসায়ীদের পথ আটকে দেশে ব্যবসা করার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। এর ফলে দেশবাসীর বেঁচে থাকার বাতাবরণটিও ভালো হয়েছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনা করলেই সকলে দেখতে পাবেন মোদীর একমাত্র লক্ষ্য একটি শক্তিশালী জাতিগঠন। এর ফলস্বরূপই স্বচ্ছ ভারত, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, জাতীয় সেচ নীতি, দক্ষ ভারত, স্মার্ট ইন্ডিয়া-সহ নতুন কিছু উদ্ভাবন করে চলেছেন যা জাতীয় জীবনে কাজে লাগবে। এই উদ্দেশে অটল উদ্ভাবনী মিশন প্রভৃতি পুরোদমে কাজ করে চলেছে। একই সঙ্গে জড়িত আত্মনির্ভর ভারত নীতি যার জন্য (আমদানি কমিয়ে দেশজ উৎপাদন বাড়ানো) স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া ও মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পগুলি অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা।

অন্যদিকে অতীতের গৌরবান্বিত ভারত সন্তানদের যেমন মহাত্মাগান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আম্বেদকারদের স্মৃতিতে আকর্ষক ও বিশাল আকারের স্মারক তৈরি করে দেশবাসীর মধ্যে তাঁদের অবদানকে জাগ্রত রাখা ও গর্ব অনুভব করার বিষয়টির গুরুত্বও তাঁর কাছে অপরিসীম। একই সঙ্গে দেশের পূর্ববর্তী সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের সম্মানিত করতে তাঁদেরও উপযুক্ত মেমোরিয়াল তিনি করবেন বলে ঠিক করেছেন।

তাঁর চরিত্রটিকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে তিনি কীভাবে প্রথম সংসদ ভবনে প্রবেশের আগে মাথা নুইয়ে ছিলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন দেশের সংবিধানই তাঁর একমাত্র পথের দিশা। তিনি দেশ পরিচালনার মন্ত্র হিসেবে সংবিধানকেই গ্রহণ করেছেন। এই সূত্রে তিনি বারবার পূর্বতন সরকারগুলির নির্দিষ্ট সুকর্মের ভূয়সী প্রশংসা বারবার করেছেন। তাঁর দুটি ছোট সিদ্ধান্তের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে তাঁর চিন্তাস্রোতটি কেমন।

প্রথমটি হলো ভিআইপি সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি লালবাতি লাগানো গাড়ির ব্যবহার বেঁধে দেন। দেশবাসীর অযথা হয়রানি রুখতে এবং তাদের ওপর আস্থা রাখতে তিনি তাঁদের প্রশংসাপত্রগুলি নিজেদেরই সনাক্ত করে দিতে বলেন। মানুষকে পদাধিকারী ব্যক্তির পায়ে পায়ে ঘোরা থেকে তিনি মুক্তি দেন। দেশের মানুষের ওপর এমন বিশ্বাস কী ইংরেজ কী অতীত সরকারগুলি কেউই রাখেনি।

আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান তাঁকে তুমুলভাবে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকটি মন্ত্রীসভার বৈঠকে তিনি মন্ত্রীদের কাছ থেকে তাদের মতামত শোনেন এবং যুক্তিগ্রাহ্য পয়েন্ট থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পুনর্বিবেচনার জন্য বৈঠক পিছিয়ে দেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে তবেই বিল পুনরায় পেশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি সমান সক্রিয়। আমি প্যারিসে তাঁকে দেখেছি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতি প্রণয়নে তিনি কী সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একটি প্রবাদ মনে পড়ে গেল 'ক্ষমা বিশাল হৃদয়ের পরিচায়ক। আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গই হচ্ছে কারুর প্রতি বিদ্বেষ না পোষণ করা।' —এই আপ্তবাক্যটিই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জীবন বেদ।

(লেখক কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য তথা দীর্ঘদিনের প্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডলের মাতৃদেবী শ্যামাদাসী মণ্ডল গত ১৬ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা শাখার খেয়ালি গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

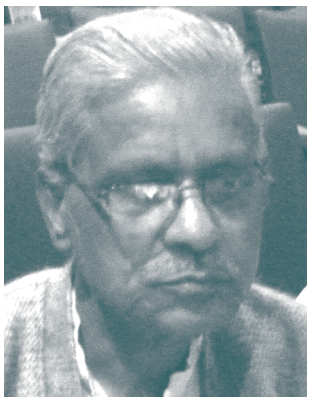

জলপাইগুড়ি জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন জেলা সঙ্ঘচালক প্রদীপলাল ঝাঁ চক্রবর্তী গত ১৯ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ কন্যা, ১ পুত্র ও ২ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার স্বয়ংসেবক দীপাঞ্জন দাস ও শুভদীপ দাসের মাতৃদেবী নমিতা দাস গত ১০ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও ২ নাতি রেখে গেছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। সঙ্ঘের বিবিধক্ষেত্রের কাজের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। উদ্বোধন ও স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধির দায়িত্বও পালন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চালাচ্ছেন মমতা

সাধন কুমার পাল

২০১৪ সালে নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েত ভোট চেয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সরাসরি বিরোধের পথে হেঁটেছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে। এই মামলায় হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টেও যেতে দ্বিধা করেননি তিনি। সেই মামলার রেশ কাটতে না কাটতে সময়ে পুরভোট চেয়ে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ওইদিনই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন মীরা পাণ্ডে। মমতার হুমকি ধমকি, মমতা বাহিনীর প্রত্যক্ষ অপমানজনক আচরণকে উপেক্ষা করে সংবিধানের রক্ষক হিসেবে নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছিলেন মীরা পাণ্ডে। এর আগে নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশনও জ্যোতি বসুদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের এরকম দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নীতিহীন, প্রতিক্রিয়াশীল, বেপরোয়া, স্বৈরাচারী ও প্রতিশোধপ্রবণ রাজনীতিক হিসেবেই অধিক পরিচিত। ফলে পশ্চিমবঙ্গে আইনসভা, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম— গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভই বিপন্ন এবং এদের মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আইন-রক্ষক অর্থাৎ সংবিধান-রক্ষকদের প্রধান কাজ মমতা ব্যানার্জির মন জুগিয়ে চলা। যার ফলে এবার নির্বাচনোত্তর হিংসার নামে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর যে নারকীয় অত্যাচার হয়েছে সেগুলির সামান্য অংশও পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া ও আমলাতন্ত্রের স্ক্যানারে ধরা পড়েনি। প্রতিফলিত হয়নি বিধানসভার কার্যাবলীতেও। কারণ মমতা বলে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর হিংসা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও উচ্চআদালতের তৎপরতায় সেই নির্বাচনোত্তর হিংসার

ভয়াবহ চিত্রের সামান্য অংশ উঠে এল। এর থেকেই স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নয়, শাসকের শাসন চলছে এবং শুধু আমজনতা নয় ভীতসন্ত্রস্ত সংবিধান-রক্ষকরাও।

পশ্চিমবঙ্গে হুমকির মুখে গণতন্ত্র রক্ষাকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান : বিচারপতিরাও কি সন্ত্রস্ত?

(১) নথি যাচাই ছাড়াই ১২ জন শিক্ষকের চাকরি, ক্ষোভে মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি : ২০১৬-য় প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় এক প্রার্থীকে। সমস্ত নথি যাচাই করেই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে দাবি স্বদেশ দাস নামে ওই প্রার্থীর। সেই মতো চাকরিও করেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে ফের তাঁর নথি চেয়ে পাঠায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শক। তাতেই উঠে আসে আসল তথ্য। কারণ টেট পরীক্ষায় পাশ করা বা তাঁর যোগ্যতা সংক্রান্ত নথির কোনও কিছুরই প্রমাণ দিতে পারেননি স্বদেশ। চাকরি থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে এই আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ওই সংক্রান্ত মামলাটি শুনানির জন্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে ওঠে। নিয়োগে অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে কাঠগড়ায় তোলেন বিচারপতি। কীভাবে ওই নিয়োগ করা হয়েছে, প্রশ্ন তোলে আদালতে। পর্ষদ ওই প্রার্থীকেই দোষী সাব্যস্ত করতে চায়। এরপর উঠে আসে চমকপ্রদ তথ্য। ওই প্রার্থী জানান, তিনি শুধু একা নন, পর্যাপ্ত নথি ছাড়া চাকরি করছেন এরকম ১২ জন। নথি যাচাই না-করেই ওঁদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। শুনানির সময় বিষয়টি জানতে পারেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। তার পরেই এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান।

(২) সরে দাঁড়ালেন বাঙ্গালি বিচারপতি : পশ্চিমবঙ্গের ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুন মাসে (২০২১) দুই বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় সিবিআই অথবা সিট তদন্তের দাবিতে মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হাতে ভাই অভিজিৎ সরকার এবং বিজেপির বুথ কর্মী হরণ অধিকারী খুন হয়েছেন, এই অভিযোগের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি এস.আর শাহের ডিভিশন বেঞ্চে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন বিশ্বজিৎ সরকার নামে এক ব্যক্তি। হরণ অধিকারীর স্ত্রী এই মামলায় দ্বিতীয় পিটিশনকারী। বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই মামলায় আমার কিছু অসুবিধে আছে। আমি নিজে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় আমায় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

(৩) নন্দীগ্রাম মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি : গত জুলাই মাসে (২০২১) বিচার বিভাগকে কলঙ্কিত করার জন্য মমতাকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করে নন্দীগ্রাম মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। এর আগেও ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গিয়েছিল রাজীব কুমার মামলার শুনানি।

বিচারপতি নাগেশ্বর রাও এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় ১৯ ফেব্রুয়ারি (২০১৯) মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি মুলতুবি হয়ে যায়। বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের যুক্তি, এর আগে একটি মামলায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। এর ফলে রাজীব কুমার মামলায় শীর্ষ আদালতে গঠিত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি রঞ্জিত খান্না ও বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের বেঞ্চ ভেঙে যায়।

(৫) **স্কুল সার্ভিস কমিশন মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি :** ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নবান্নের উপর অনাস্থা হাইকোর্টের, সরলেন বিচারপতি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপর বিরক্ত হয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন। সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'এসএসসির উপর আমার কোনো আস্থা নেই।' শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এর আগে নবান্ন যে হাইকোর্টের কত থাপ্পড় খেয়েছে তার হিসেব রাখা কঠিন। ২০১৬ সালে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছিল। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৮ সালে। তারপর থেকে অনিয়মের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। এক্ষেত্রে মামলাকারীদের বক্তব্য, গণিত শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসসি ও এসটিদের সংরক্ষিত আসনের জন্য যে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয় তাতে ১১৪ নম্বরে নাম থাকা প্রার্থীকে নিয়োগপত্র না দিয়ে ১৫২ নম্বরে যার নাম তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে রিপোর্ট তলব করেছিল হাইকোর্ট। কমিশনের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, এক্ষেত্রে ভুল হয়ে গিয়েছে। উত্তরে বিচারপতি বলেন, এটা ভুল না ইচ্ছাকৃত দুর্নীতি তা স্পষ্ট নয়। এর আগেও বিভিন্ন অনিয়মের প্রসঙ্গ তোলেন বিচারপতি। তারপর কার্যত বিরক্ত হয়ে বলেন, এই মামলা তিনি আর শুনবেন না।

নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে খুনের মামলার হুমকি :

নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই

সংবিধানের সাহায্য নিয়ে নির্বাচিত হয়ে কীভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তার জ্বলন্ত নজির সৃষ্টি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র ভারতের পক্ষেই এটা বিপজ্জনক প্রবণতা।

কমিশনের বিরুদ্ধে মমতার ক্ষোভের সূচনা হয়। মমতার প্রশ্ন ছিল কেন পশ্চিমবঙ্গে এত দফায় ভোট নেওয়া হবে? এবার রাজ্যে প্রায় ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। বুথের ১০০ মিটারের বাইরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে— কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে মমতার অভিযোগ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে এই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে কমিশন চলছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মমতা। করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শেষের তিনদফা ভোট একসঙ্গে হতে পারে এরকম একটি জল্পনা শুরু হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জিও এই দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজি না হওয়ায় মমতা ব্যানার্জি এই বলে হুমকি দিয়েছিলেন যে করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে তার দায় বর্তাবে নির্বাচন কমিশনের উপর এবং সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুমকি :

৭ এপ্রিল ২০২১ বুধবার দুপুরে কোচবিহারের জনসভায় মমতা বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা সিআরপিএফ এমনকী, রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, ভোটের সময় রাজ্যে কিছু 'বিজেপি-সিআরপিএফ' এসেছে। তারাই ভোটারদের হেনস্থা করছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশেই সিআরপিএফের একাংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী। সেই সঙ্গে ভোটদাতা এবং তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, কেন্দ্রীয় বাহিনী 'গণ্ডগোল' করার চেষ্টা করলে মহিলারা যেন তাদের ঘেরাও করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এক দল ঘেরাও করে রাখবেন। এক দল ভোট দিতে যাবেন। ভোট নষ্ট করবেন না। আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন, তাহলে ভাববে ভালোই তো ভোটটা পড়ল না। এটাই বিজেপির চাল।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক, যিনি এর আগে বিহারে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার ছিলেন, সেই অজয় নায়েক ২২ এপ্রিল ২০১৯ রবিবার সাংবাদিকদের সামনে ১০-১৫ বছর আগের বিহারের সঙ্গে আজকের পশ্চিমবঙ্গের তুলনা টেনেছেন। মন্তব্য করেছেন, রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে সাধারণ মানুষ। তাই তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় ভোট করানোর দাবিতে এত সরব হয়েছেন।

নির্বাচন চলাকালীন নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের হুমকি :

নির্বাচন ঘোষণা হতেই রাজ্য প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে যায়। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ উঠলে নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে কমিশন তাদের সরিয়ে সেখানে অন্য কোনো অফিসারকে বসান। কোনো অফিসারের নিরপেক্ষতা যদি তৃণমূল কংগ্রেসের স্বার্থের কিংবা রিগিং মেশিনারির বিরুদ্ধে যায় তাহলেই তৃণমূল নেত্রীর তরফে নির্বাচনের পর সেই সমস্ত অফিসারকে দেখে

নেওয়ার হুমকি আসতে থাকে এবং তৃণমূলের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্ত অফিসারদের জন্য পুরস্কৃত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হতে থাকে। প্রতিবারের মতো তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েই সবার প্রথমে তৃণমূলনেত্রী এই অফিসারদের পুরস্কার তিরস্কারের কাজটি সারেন। তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর নবান্নে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনিক পদে রদবদলের সিদ্ধান্ত নেন। মূলত নির্বাচন কমিশন যেসব অফিসারদের সরিয়ে দিয়েছিল তাঁদের পুনরায় পুরোনো পদে পাঠানোর নির্দেশিকা জারি করেন তিনি। রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হয়েছিল নীরজ নয়নকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য সরকার বীরেন্দ্রকে তাঁর পুরনো পদে বহাল করে। পাশাপাশি নীরজ নয়নকে রাজ্যের দমকল বাহিনীর ডিজি পদে পাঠিয়ে জাভেদ শামিমকে তাঁর পুরনো এডিজি আইন-শৃঙ্খলা পদে ফিরিয়ে আনা হয়। নির্বাচন কমিশন জাভেদ শামিমকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে সে জায়গায় দমকল বাহিনীর ডিজি জগমোহনকে এডিজি আইন-শৃঙ্খলা পদে নিয়োগ করেছিল। রাজ্য সরকার জগমোহনকে অসামরিক নিরাপত্তা অর্থাৎ সিভিল ডিফেন্সের ডিজি পদে নিয়োগ করেছে। শীতলকুচী গুলিকাণ্ডের দায় চাপিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বদল করা হয়েছে কোচবিহারের পুলিশ সুপারকেও। এছাড়া আরও বেশ কিছু জায়গায় অফিসারদের তাঁদের পুরনো পদে ফিরিয়ে আনা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার পরে পূর্ব মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলাশাসক বিভূ গয়ালকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তাঁর জায়গায় নির্বাচন কমিশন নিয়ে এসেছিল স্মিতা পাণ্ডেকে। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সরিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। তাঁর জায়গায় নতুন জেলাশাসকের দায়িত্ব নিয়ে আসছেন পূর্ণেন্দু মাজি। পূর্ণেন্দুবাবু এর আগে ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের সচিব ছিলেন। স্মিতা পাণ্ডেকে ওয়েবলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পুরুলিয়ার জেলাশাসক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কেও বদলি করা হয়েছে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে কম্পালসরি ওয়েটিঙে। তাঁর জায়গায় নতুন জেলাশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাহুল মজুমদারকে।

মমতার রক্তচক্ষু দেখে নির্বাচন কমিশনাররাও কি ভীত?

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। রাজ্যে গোসাবা, খড়দা, শান্তিপুর, দিনহাটা-সহ ৫ কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও, শুধুমাত্র ভবানীপুরেই উপনির্বাচন হচ্ছে ৩০ সেপ্টেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব লিখেছেন ভবানীপুরে উপনির্বাচন না হলে রাজ্যে সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হবে। আমলাতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে মুখ্যসচিব একজন রাজনৈতিক নেতার হয়ে এটা লিখতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪-এর মধ্যে সাত জায়গায় বিধায়ক নেই। এখানে সাংবিধানিক কী জটিলতা আসবে? মুখ্যসচিবের এই চিঠি, তার ভিত্তিতে কমিশনের এই স্পেশাল কেস হিসেবে উপনির্বাচন করানো প্রমাণ হয়েছে, এখানে শাসকের আইন চলে, জনগণের আইন চলে না। নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ বলেই মনে করছেন ভারতের একদল সাবেক শীর্ষস্থানীয় আমলা--- যাদের অন্যতম হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য সচিব অর্ধেন্দু সেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন করেছিলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট করতে হবে দেশের মধ্যে কেন শুধুমাত্র ভবানীপুরে উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? সংবিধানের সাহায্য নিয়ে নির্বাচিত হয়ে কীভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তার জ্বলন্ত নজির সৃষ্টি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র ভারতের পক্ষেই এটা বিপজ্জনক প্রবণতা। অবিলম্বে কেন্দ্রের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। □

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

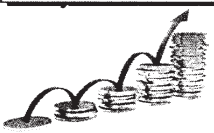

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

ঔরঙ্গজেবের অপকীর্তি বামপন্থীরা চাপা দিতে চান

অমলেশ মিশ্র

মথুরার কেশবদেব মন্দির ১৬৭০ সালের জানুয়ারি মাসে ধ্বংস করা হয়। ১৬৬৯ সালের ৯ এপ্রিল, ঔরঙ্গজেব একটি ফরমান জারি করলেন। ঔরঙ্গজেবেরর জীবনী 'মাশির-ই-আলমগিরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে—The Emperor ordered the Governments of all provinces to demolish the schools and templs of the infidels and strongly put down their teaching and religious practice–(ইংরাজি অনুবাদক যদুনাথ সরকার লিখত History of Aurangzeb Vol.-3, P.–186) । সম্রাট সমস্ত প্রদেশের শাসকদের আদেশ দিলেন অবিশ্বাসীদের সমস্ত শিক্ষালয় ও মন্দির ধ্বংস করে দিতে এবং কঠোরভাবে তাদের পড়াশোনা ও ধর্মাচরণ বন্ধ করতে। সাকি মুস্তাক খানের লেখা মাশির-ই-আলমগিরি পুস্তকে এই রকমই লিখেছেন।

আর একটি সূত্র আলবরাত্-এ লেখা আছে, The Emperor learning that in the temple of Kesov Rai at Mathura there was a stone roiling presented by Dara Sukoh, remarked–to the Muslim faith it is a Sin ever to look at a temple and this Dara had restored a railing in a temple. This fact is not creditable to the Muhammedans. Remove the railing (ইংরাজি অনুবাদ যদুনাথ সরকার পুস্তক পৃঃ ১৮৬) । অর্থাৎ সম্রাট জানতে পারলেন যে মথুরার কেশবরাই মন্দিরে একটি পাথরের বেড়া দারাসুকো বসিয়েছেন। বললেন যে, ইসলামি বিশ্বাস হলো অন্ধকারে মন্দিরের দিকে তাকালেও মুসলমানদের পাপ। ওই বেড়া হটিয়ে দাও।' এই আদেশানুসারে মথুরার ফৌজদার আবু নবি খান ওটি সরিয়ে দিলেন।

জেহাদি মনোভাবই সমস্ত সমাজে অশান্তির কারণ হয়। কয়েক হাজার বছর আগেকার দুনিয়ায় যা কর্তব্য বিবেচিত হয়েছিল, ১৫০০ বছরের বিবর্তনের পর তা আর কর্তব্য থাকতে পারে না। এই সাধারণ কথাটুকু সকলেরই বোঝা দরকার।

সময়টা ১৬৭০ এর জানুয়ারি মাস—রমজান মাস। সম্রাট কেশবরাই মন্দির ভাঙার আদেশ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আদেশ পালিত হলো। বহু অর্থ ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য মসজিদ সেই স্থলে নির্মিত হলো। কেশবদেব মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন বীর সিং দেব বুন্দেলা। তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছিল। ..... ছোটো বা বড়ো মূর্তিগুলি রত্নখচিত ছিল। সেগুলি আগ্রায় আনা হলো এবং বেগমশাহি মসজিদে উঠার সিঁড়ির ধাপগুলিতে প্রোথিত হলো যাতে বিশ্বাসীরা নিয়মিত এগুলি পদদলিত করতে পারে। (স্যার যদুনাথ সরকার প্রণীত History of Aurongzeb, Vol. III, P.–186. সীতারাম গোয়েলের উল্লিখিত পুস্তকের পৃ. -৭৯)

সারা দেশ জুড়ে পুরানো মন্দির সব ধ্বংস করা হতে লাগল এবং সম্রাটের আদেশে নতুন কোনও মন্দির তৈরি হয়ে থাকলে সে সমস্ত ধ্বংস করা হলো। এরকম শত শত উদাহরণ আছে।

লক্ষণীয় যে, মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেছেন যে ঔরঙ্গজেব কেশবদেব মন্দিরের রত্নাদি সম্পত্তিতে লুব্ধ হয়ে এবং বুন্দেলাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য মথুরার এই কাণ্ড করেন। এর উত্তরে ইতিহাসের তথ্য দিয়ে বলা যায় যে সম্রাটের আদেশ মোতাবেক মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের কাজ কেবল মথুরাতেই হয়নি, দেশজুড়ে কয়েক শত

মন্দির ও মূর্তি একা ঔরঙ্গজেবের আদেশে ধ্বংস করা হয়েছে। তার ফরমানে সবসময়ই উল্লেখ থেকেছে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের এটি একটি করণীয় কর্তব্য বলেই তিনি মনে করেন। (অবিশ্বাসী অর্থে অমুসলমান হিন্দু আর বিশ্বাসী অর্থে মুসলমান যারা আল্লাহ্ ও মহম্মদের উপর বিশ্বাস রাখে।)

দ্বিতীয়ত, রোমিলা থাপাররা বলেন যে, জাঠ ও বুন্দেলাদের বিদ্রোহ সম্রাটকে উত্যক্ত করেছিল। তিনি তাদের তিনি তাদের উচিত শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য, প্রথম বুন্দেলা বিদ্রোহ শাহজাহানের সময় ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এবং তা দমন করা হয়। দ্বিতীয় বিদ্রোহ ১৬৬১ সালে। বিদ্রোহের নেতা চম্পৎ রাই আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর তৃতীয় কোনও বুন্দেলা বিদ্রোহের খবর ইতিহাসবেত্তারা কেউ জানেন না। আর জাঠদের বিদ্রোহ হয়েছিল ফরমান জারির পরে। তৃতীয়ত, বুন্দেলখণ্ড ও মথুরা কোনও নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী স্থান নয়। দুটির অবস্থানিক দূরত্ব কয়েকশত মাইল। চতুর্থত, ঔরঙ্গজেবের আদে নামায় খুব পরিষ্কার করেই তার ধর্মান্ধতা যা তার ধর্মবিশ্বাস বলা হয়ে থাকে, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে—অর্থ, মণিমুক্তো ও বিদ্রোহ ইত্যাদি নিতান্তই কষ্টকল্পনা।

মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদরা কষ্টকল্পনায় যে কতটা পটু তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তারা বলেন, ইসলাম আগমনের আগে হিন্দু রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধ ও জৈনমঠ ধ্বংস করে তার উপর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য এরা একটিও উদাহরণ দিতে পারেননি যেখানে বৌদ্ধ ও জৈনদের মঠের উপরে মন্দির নির্মিত হয়েছিল। গোয়েবলসের মতোই মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে তাঁদের কথাই যথেষ্ট, উদাহরণের প্রয়োজন নাই। মার্ক্সবাদী ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় লেখা হলো— If the descendats of Godse think that every medieval mosque has been built after demolishing some temples, why should we stop at the medieval period ? After all Hindu Kings had got a large number or of Jain and Buddhist temples destroyed. The Krishna temple at Mathura rose on the ruins of such places (that is, Hindu temples built of the ruins of Buildhist and Join places of worship) in Karnataka, Rajasthan, Bihar and Uttarpradesh. অর্থাৎ গড্‌সের উত্তরাধিকারীরা যদি মনে করেন যে মধ্যযুগে যাবতীয় মসজিদ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার উপর নির্মিত হয়েছিল, তাহলে শুধু মধ্যযুগের কথাই-বা কেন? হিন্দু রাজারা জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে তার উপর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, মথুরাতেও ওইরকম ঘটেছে (জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে হিন্দুমন্দির নির্মিত হয়েছে) কর্ণাটকে, রাজস্থানে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশেও। (প্রকৃতপক্ষে মথুরার ক্ষেত্রে এইরকম প্রশ্ন উঠেছিল ঠিকই কিন্তু তা অপ্রমাণিত থেকেছে)।

Hindu Temples what happened to them (Vol.–I, Vol–II) গ্রন্থের লেখক সীতারাম গোয়েল এই সব মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদদের প্রতি ৭টি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ছয়মাসের মধ্যে উত্তর চেয়েছিলেন। ১৯৯১ থেকে ২০২১ সাল—৩০ বছরের মধ্যেও মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদরা উত্তর দিতে পারেননি যদিও রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অদ্যাপি জীবিত।

প্রশ্নগুলি বা চ্যালেঞ্জ গুলি হলো—

১। হিন্দুরা যে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির ভেঙেছিল তেমন কোনও প্রমাণ সূত্র উল্লেখ করুন।

২। হিন্দু রচিত এমন কোনও সাহিত্য দেখান যেখানে উল্লেখ আছে হিন্দুরা বৌদ্ধ ও জৈনদের মন্দির ভেঙেছিল।

৩। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে একটি উদাহরণ তুলে দেখান যে হিন্দুধর্মতত্ত্বে পরধর্মের উপর অত্যাচার ও মন্দির ধ্বংসের কথা আছে।

৪। প্রাচীনকালে বা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে হিন্দুরা কোন কোন জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির ভেঙেছিল তার একটি তালিকা দিন।

৫। বৌদ্ধ, জৈন বা অন্যকোনও ধর্মস্থানের উপর হিন্দুদের মন্দির নির্মিত হয়েছিল বা ধ্বংস করা মন্দিরের উপাদান ব্যবহার করে।

৬। বৌদ্ধ, জৈন বা অন্য কোনও মতাবলম্বী একজনের নাম করুন যিনি হিন্দুদের সম্পর্কে এই অভিযোগ করেছেন।

৭। জৈন, বুদ্ধ ও অন্যকোনও সম্প্রদায় তাদের ধ্বংস হওয়া মন্দিরাদি পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়েছে এবং হিন্দু কোনও নেতা তার প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমেছেন।

উল্লেখ করেছি, ১৯৯১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরের মধ্যেও কেউ এই চ্যালেঞ্জের বা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেননি। মার্ক্সবাদী ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা ভুলে যান বা পড়েননি যে কোরানে সুন্নাহর মৌলিক তত্ত্ব হলো—'বিশ্বে ইসলাম ব্যতীত আর কারুর থাকার অধিকার নাই। নিরাকার আল্লাহর কোনও অংশ বা কোনও শরিকানাই হতে পারে না। যারা ঈশ্বরের আকার কল্পনা করে ও নানা দেবদেবীর পূজা করে, তারা অবিশ্বাসী এবং ইসলামের শত্রু। এই শত্রু নিধন এবং ওইসব দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করা বিশ্বাসীদের ধর্মীয় কর্তব্য।' এইরকম বহু জেহাদি আয়াত ও জেহাদি কাজ ইসলামিদের মধ্যে বহু সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই জেহাদি মনোভাবই সমস্ত সমাজে অশান্তির কারণ হয়। কয়েক হাজার বছর আগেকার দুনিয়ায় যা কর্তব্য বিবেচিত হয়েছিল, ১৫০০ বছরের বিবর্তনের পর তা আর কর্তব্য থাকতে পারে না। এই সাধারণ কথাটুকু সকলেরই বোঝা দরকার। ▫

With Best Compliments from :

A Well Wisher

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুরা সংকটে

ভারতকে 'ইসলামিস্তান' বানাতে ইসলামিক জঙ্গি-জোহাদিরা অতিশয় সক্রিয়। তাই ভারতকে হিন্দুগরিষ্ঠ দেশ রাখতে হলে আইন করে কঠোরভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু ও ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করতে হবে।

ধীরেন দেবনাথ

গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী নীতীন প্যাটেল গান্ধীনগরে ভারতমাতা মন্দিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্প্রতি বলেছেন, 'এদেশে ততদিন গণতন্ত্র, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, আইন ও আদালত থাকবে, যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। আর যেদিন হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাবে, আর অন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সেদিন দেশে না থাকবে কোনো আইন, না থাকবে কোনো আদালত। সবই যাবে উড়ে। কিছু থাকবে না।'

মন্ত্রী একশো শতাংশ সঠিক কথাই বলেছেন। কারণ তিনি দিব্যজ্ঞানী নন, কাণ্ডজ্ঞানী। দিব্যজ্ঞানীরা ভাবাবেগী। তাই তাঁদের চোখে মন্দটা ধরা পড়ে না। মন্দকে তাঁরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। যেটা বহুক্ষেত্রে সমাজ ও জাতির পক্ষে হয় ক্ষতিকর। তাঁরা কোদালকে বলেন খনিত্র। কালোকে দেখেন সাদা। কাণ্ডজ্ঞানীরা মন্দকে মন্দ বলেন। কালোকে কালোই দেখেন। কোদালকে কোদালই বলেন। তাই কাণ্ডজ্ঞানী মন্ত্রী মহাশয় বাস্তব পরিস্থিতির কথা ভেবে নির্দ্বিধায় তাঁর অভিমত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। এজন্য তাঁকে জানাই হার্দিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। তাঁর মতো সত্য ও স্পষ্টবাদী হিন্দু এদেশে খুব কম জন্মেছেন। এটাই বড়ো পরিতাপের বিষয়। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সগর্বে বল আমি হিন্দু'। যদিও সেকুলারবাদীদের কাছে তিনি আজও সাম্প্রদায়িক। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

ভারতবর্ষ আজও হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশটা ভারত ও হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। মুসলমান শাসকরাও এদেশকে বলতেন 'হিন্দুস্থান'। বহু মুসলমান দেশের

নীতীন প্যাটেল

কাছেও এদেশ হিন্দুস্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের হিন্দুনামধারী 'সেকুলারবাদী'দের দৃষ্টিতে হিন্দু শব্দটি 'সাম্প্রদায়িক'। কেউ নিজেকে হিন্দু বললে হিন্দু-বিদ্বেষী বর্বর সেকুলারবাদীরা তার নিন্দায় হয় সরব। তাই অধিকাংশ হিন্দু প্রকাশ্যে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় না, পাছে তাদের বর্বরদের হাতে নিগৃহীত ও অপমানিত হতে হয়— এই ভয়ে। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা, ভীতি ও হীনমন্যতা। অবস্থাটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মতো নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবতে শুরু করেছে। তারা নিজভূমে পরবাসী বলে মনে করছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

পক্ষান্তরে, এদেশের বিশেষত এরাজ্যের জামাই আদরে থাকা মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সংখ্যাগুরু বলে মনে করে। তারা নিজেদের 'মুসলমান' বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। আর করবেই-বা কেন? তারা যে এ রাজ্যের তালিবানি সরকারের ভোটব্যাঙ্ক। 'দুধেলগাই'! তার প্রমাণ, এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রায় ৩৫ শতাংশ মুসলমান ভোটের ৯৫ শতাংশ ভোট গেছে তৃণমূলের পক্ষে। এছাড়াও কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূলের হিন্দু বিদ্বেষী হিন্দু ভোটও পেয়েছে তৃণমূল। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, মূলত মুসলমান ভোট ও মুসলমান দরদি হিন্দু ভোটেই তৃণমূলের জয় এসেছে। অর্থাৎ, মুসলমানরাই এ রাজ্যে ভোটযুদ্ধে জয়ের নির্ণায়ক শক্তি। তাই মুসলমান ভোট যেদিকে, জয়ও যাচ্ছে সেদিকে। আবার এবারে ভোট এ রাজ্যে সৃষ্টি করেছে একটা নতুন ইতিহাসও। সেটা হচ্ছে, কাশ্মীর, কেরলের পর পশ্চিমবঙ্গ এখন তৃতীয় মুসলমান প্রধান রাজ্য। এর অর্থ, ক্ষমতাসীন সরকার মুসলমানদের দাবিদাওয়া,

তা যতই অন্যায্য ও আপত্তিকর হোক না কেন, ভোটের স্বার্থে মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। সেই দাবিগুলির মধ্যে থাকবে প্রকাশ্যে গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রি, জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরকরণ ও হিন্দুনারীদের বিয়ে করা, রাস্তা বন্ধ করে ইদের নামাজ পড়া, পড়াশোনা ও চাকরিতে সংরক্ষণ ইত্যাদি। এমনিতেই মুসলমান সমাজে এখনও একাধিক বিবি রাখা ও বহু সন্তানের জন্ম দেওয়ার রীতি রয়েছে। এরপর 'লাভ জেহাদ'-এর ফাঁদে ফেলে হিন্দু নারীদের এবং ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে হিন্দুদের মুসলমান সমাজ টেনে নিতে থাকলে, আর এক স্ত্রী ও একটি বা দুটি সন্তানে সন্তুষ্ট হিন্দুরা জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি মেনে চললে জন্মনিয়ন্ত্রণে অবিশ্বাসী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এবং হ্রাস পেতে থাকবে হিন্দুর সংখ্যা, যা বর্তমানে অব্যাহত। আর এভাবে চলতে থাকলে, অদূর ভবিষ্যতে সারাদেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। অতঃপর সেকুলারবাদী, মুসলমানপ্রেমী, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অচেতন হিন্দুরা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' থেকে জেগে দেখতে পারে রাজ্যটা লুঙ্গিবাহিনীতে ভরে গেছে এবং তারা 'মালাউন' হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, 'দারুল হার্‌ব্‌' (বিধর্মীদেশ)-কে 'দারুল ইসলাম' (ইসলামিক দেশ)-তে পরিণত করাই মুসলমানদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও শিক্ষা। ভুললে চলবে না, অবিমৃশ্যকারী, সেকুলারবাদী ও মূর্খ হিন্দুরা মুসলমানদের যতই বন্ধু ভাবুক, মুসলমানরা কিন্তু হিন্দুদের বন্ধু ভাবে না। কারণ ইসলামিক রীতিতে 'কাফেররা' মুসলমানদের বন্ধু নয়, শত্রু। তবু কেউ হিন্দুকে বন্ধু ভাবলে সেটা ইসলাম বিরোধী এবং অবশ্যই ব্যতিক্রমী ব্যাপার বা কোনো স্বার্থ সিদ্ধির স্বার্থে। স্বামীজী তাই যথার্থই বলেছেন, 'হিন্দুধর্ম ছেড়ে কেউ বেরিয়ে গেলে যে শুধু হিন্দুর সংখ্যায় কমে যাচ্ছে তাই নয়, হিন্দুর শত্রু সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।' ('হিন্দুধর্মের পরিসীমা'— এপ্রিল, ১৮৯৯, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সবাই অংশগ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভারতছাড়া করা। মূলত ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য যদি অস্তমিত হয়ে থাকে, তবে ১৮৫৭ সাল ছিল মহাবিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাকাল। তবে দেশভাগের ষড়যন্ত্রের মূল পাণ্ডা ছিলেন কার্জন। মুসলমান নেতাদের একটি মুসলমান প্রদেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। আর সেই থেকে ইংরেজ শাসকদের মুসলমান তোষণের শুরু। অতঃপর তাদের অনুপ্রেরণায় ১৯০৬ সালে গঠিত হয় মুসলিম লিগ। তারা ইংরেজরাজের প্ররোচনায় স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতা করে পৃথক নির্বাচনকে মেনে নেয়। মালাবারে ইংরেজ বিরোধী ক্ষুব্ধ হিন্দুরা থানা-পুলিশকে আক্রমণ করলে মোপলা মুসলমানরা কয়েক হাজার হিন্দুকে হতাহত করে, অগণিত হিন্দুনারীকে করে ধর্ষণ এবং বহু হিন্দুকে করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য। গান্ধীজী জল্লাদ-ধর্ষক মোপালা মুসলমানদের ধর্মানুরাগ, সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, 'আহা, ওরা উত্তেজনাবশত ওটা করে ফেলেছে, যৌনক্ষুধা মিটিয়েছে!'

এরপর মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির জোরালো দাবি ওঠে। ১৯৩০ সালে লিগ নেতা ও কবি ইকবাল এলাহাবাদে লিগ সম্মেলনে মুসলমান বাসভূমির দাবি তোলেন। ইনিই আবার 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'র রচয়িতা। সত্যি বলতে, পণ্ডিত-মূর্খ মুসলমান মাত্রই যে ভণ্ড, বেইমান ও সাম্প্রদায়িক তা বলাই বাহুল্য। ব্যতিক্রমী দু-চারজন। তাঁরা নমস্য। অতঃপর ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে মুসলমানদের জন্য স্বাধীনরাষ্ট্র গঠনের দাবি পাশ হয়। পূরণ হয় পাক-কবি ইবালের ইচ্ছা।

এদিকে বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি পাকিস্তানের মধ্যে সম্পূর্ণবাঙ্গলা নেই দেখে হতাশ হন। তিনি বাঙ্গলাকে পাকিস্তানভুক্ত করতে এবং নিজের ক্ষমতা দেখাতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দেন।' ৪৬-এর ১৬ আগস্ট পবিত্র রমজানমাসের শুক্রবার সশস্ত্র মুসলিম লিগের গুন্ডারা গভীর রাতে নামাজ সেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত হিন্দুদের উপর। তারা হাজার হাজার হিন্দুকে নির্বিচারে হত্যা করে। বাদ যায়নি নারী-শিশুরাও। অসংখ্য নারী হয় ধর্ষিতা ও অপহৃতা। লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয় অগণিত বাড়ি। সুরাবর্দি এই দাঙ্গা পরিচালনা করেন। ইংরেজ শাসকরাও ছিল দাঙ্গার মদতদাতা। এই দাঙ্গার সমর্থক ছিলেন কমিউনিস্টরাও। প্রমাণ? তাঁদের স্লোগান ছিল— 'পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। পাকিস্তান দাবি ন্যায্য দাবি' ইত্যাদি এবং মনুমেন্টের নীচে সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়ার সভায় জ্যোতি বসুর উপস্থিতি। এর প্রায় দু'মাস পরে ১০ অক্টোবর লিগ গুন্ডা গোলাম সরওয়ারের নেতৃত্বে লক্ষ্মীপুজোর দিন নোয়াখালিতে ঘটে আর এক হিন্দু নিধন যজ্ঞ। মদতদাতা সরওয়ারের ওস্তাদ সুরাবর্দি। কয়েক হাজার অসহায় হিন্দু নর-নারী ও শিশু হতাহত হয়। যথারীতি ঘটে নারী ধর্ষণ, অপহরণ, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ। করে ধর্মান্তরিতও। বাঙ্গলার দু'দুটি পরিকল্পিত হিন্দুনিধন-দাঙ্গার সাফল্যে সুরাবর্দি, জিন্না, জ্যোতি বসু ও ইংরেজ শাসকদের মুখের হাসি আরও চওড়া হলেও হতবাক নেহরু হতাশ হননি। গান্ধীজী তো তখন পালন করছিলেন 'মৌনব্রত'। তাছাড়া তাঁর উপর ভরসা হারাচ্ছিল হিন্দুরাও। তারা তাঁকে বলত 'মৌনী বাবা'। আর মুসলমানরা বলত ভণ্ড, নেংটি পরা গান্ধী। আবার স্বাধীন ভারতে অনেকের মন্তব্য, গান্ধীজী পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' হলে সঠিক হতো।

কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগের পর পাকিস্তান ইসলামিক দেশ হলেও ভারত হয় ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ফলে পকিস্তান থেকে অধিকাংশ হিন্দু ভারতে চলে এলেও, ভারতের অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সেকুলারিস্টদের আশ্বাসে ভারতেই থেকে যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো, অথচ ভারত হিন্দুদেশ না হয়ে হলো ধর্মনিরপেক্ষ! হলো না লোক বিনিময়ও! মুসলমানপ্রেমী গান্ধীজী, নেহরু অ্যান্ড কোং-এর আত্মঘাতী নীতির বিষাক্ত ফল তাই আজ হিন্দুদের ভোগ করতে হচ্ছে। তারা আজ নিজভূমে পরবাসী হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে, অদূর ভবিষ্যতে ভারত হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলমান দেশ। তাই সাধু সাবধান! ভারতকে হিন্দুগরিষ্ঠ দেশ রাখতে হলে আইন করে কঠোরভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু ও ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করতে হবে। অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করতে হবে সিএএ কার্যকরী করে। ভারতকে 'ইসলামিস্তান' বানাতে ইসলামিক জঙ্গি-জোহাদিরা অতিশয় সক্রিয়। তারা ইদানীং মুসলমানদের মধ্যে তালিবাননীতি প্রচার করছে। তাই সরকার তাদের কঠোর হাতে দমন করতে না পারলে ভারত অস্তিত্বসংকটে পড়বে। □

এক সন্ন্যাসী এবং এক মারাঠি তরুণ

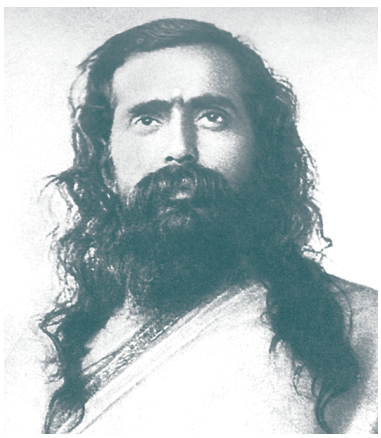

সূর্যশেখর হালদার

পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের রাজধানী কলকাতা শহরের একশো কুড়ি মাইল উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলায় সারগাছি নামে একটি গ্রাম আছে। সারগাছি শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘন গাছের ঝাড় সমূহ। বঙ্গদেশে বনজ সম্পদ প্রভূত থাকলেও এখানকার গ্রামের মানুষ চিরকালই গরিব। গ্রামের লোকেরা অধিকাংশ নির্ধন এবং তারা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত।

১৮৯৬ সালের ঘটনা। এক যুবক সন্ন্যাসী ঘুরতে ঘুরতে ওই গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য তথা স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ভাই। গঙ্গার তীর বরাবর যাত্রা করে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল এই যুবক সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য। তিনি ভাবতেন হিমালয়ের কোনও নির্জন গুহার মধ্যে থেকে সেখানে ধ্যান ও জপতপ করে কাটাবেন এই জীবন। এই ভাবনা নিয়েই কলকাতা থেকে চলতে চলতে যুবক সন্ন্যাসী এসে পৌঁছলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে।

গ্রামে পৌঁছে তিনি দেখলেন গ্রামে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। গ্রামবাসীরা কষ্ট করে দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে আসছে। চাষি ঘরের একটি ছোট্ট মেয়ে কলসি কাঁখে জল নিয়ে ফিরছিল বাড়ির দিকে। হঠাৎই রাস্তায় পাথরে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল মেয়েটি। তরুণ সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ওঠালেন। মেয়েটির কোথাও আঘাত না লাগলেও তার কলসীটি ভেঙে গিয়েছিল। মেয়েটি সেই কারণে কাঁদতে আরম্ভ করল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল যে কলসী ভেঙে ফেলার জন্য তার বাবা তাকে মারবে। তরুণ সন্ন্যাসী তাকে একটা নতুন কলসী কিনে এনে দিলেন। তখন সে শান্ত হয়ে আবার জল আনতে চলল।

সন্ন্যাসীর এই দয়ার কথা আশেপাশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এই দয়াবান সন্ন্যাসীকে দর্শন করবার জন্য আসতে লাগল। সন্ন্যাসী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথা বললেন। গ্রামবাসীরা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তরুণ সন্ন্যাসীকে বলতে লাগল আর সন্ন্যাসীও যেন গ্রামবাসীদের মধ্যে দরিদ্র নারায়ণের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি শুরু করলেন গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশা দূর করার পরিকল্পনা ও কাজ। গ্রামবাসীরাও তাঁর কথামতো কাজ করতে লাগল এবং ক্রমে সেখানে এক সুন্দর আশ্রম গড়ে উঠল।

প্রতিদিন রাত্রে ঘুমতে যাওয়ার সময় সেই সন্ন্যাসী স্থির করতেন কাজ পূর্ণ হয়ে গেলেই তিনি এখান থেকে গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা করবেন, কিন্তু পরদিন আবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা হতো আর পূর্বের সব কথা ভুলে গিয়ে গ্রামবাসীদের কল্যাণের কাজে মগ্ন হয়ে যেতেন। এভাবে মাস, বছর কাটার পর সন্ন্যাসী সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই সারগাছি গ্রামই তাঁর হিমালয়, তাঁর সাধনস্থল গঙ্গোত্রী।

গ্রামের মানুষদের সেবা করাই তাঁর জীবনের ধ্যান,জ্ঞান ও তপস্যা। তিনি সারগাছিতে থেকেই গ্রামবাসীর সেবা করাকে নিজের জীবনের কর্তব্য বলে স্থির করলেন। তাঁর এই মনের কথা পত্র দ্বারা তিনি জানালেন তাঁর গুরুভাই তথা বিশ্ববন্দিত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে। অত্যন্ত খুশি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সারগাছি আশ্রমের জন্য দুজন দক্ষ কার্যকর্তা এবং অর্থ পাঠালেন। তরুণ সন্ন্যাসীকে লেখা এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখলেন , 'যেমন-যেমন তোমার কাজের বিস্তারিত সংবাদ আমি পাচ্ছি তেমন-তেমন আমার মন আনন্দে অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। একথা সত্য যে এই ধরনের কাজের দ্বারাই বিশ্ব বিজয় হতে পারে, এ ধরনের কাজে না জাতিভেদ না মতভেদের কোনও স্থান আছে। তুমি ধন্য। তোমাকে আমি আমার হৃদয়ের কোটি কোটি ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি।'

সেই তরুণ সন্ন্যাসী তারপর সারা জীবন সারগাছিতে থেকে জনসেবার মাধ্যমে জীবন কাটিয়েছিলেন। ধূপ যেমন নিজে জ্বলে সর্বত্র গন্ধ বিতরণ করে নিঃশেষ হয়ে যায়, ঠিক সেরকমই তিনি নিজের জীবন অপরের সেবায় ব্যয় করেছিলেন। এভাবেই জনসেবা করতে করতে যখন সেই তরুণ সন্ন্যাসী বৃদ্ধ হয়েছেন, তখন একদিন তার সাক্ষাতে এলেন এক তরুণ মারাঠি যুবক। তিনি এক সদাচারী শিক্ষকের পুত্র। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় এমএসসি ডিগ্রি অর্জন

করেছেন এই যুবক। বংশের একমাত্র প্রদীপ তিনি। বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছিল তাদের মেধাবী সন্তান বিবাহ করে সংসারধর্মে স্থিত হোক। কিন্তু যুবকের মনে তখন দেশসেবার কজে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা। ভারতের সনাতন ধর্ম, সংস্কার তাঁর মনে। তিনি প্রকৃতিগত ভাবে সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক। তাই মাকে বুঝিয়ে দেশ সেবার জন্য ততদিনে গৃহত্যাগ করেছেন তিনি। আজকের সমাজে যেখানে শুধু পরিবার দেখাশোনার জন্য জীবিকা নির্বাহ করা জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সেই যুবক মাকে বুঝিয়েছিলেন যে দেশসেবার জন্য তাঁর বংশধারা যদি লুপ্ত হয় তো হোক, তবুও তিনি দেশসেবার লক্ষ্যে অবিচল থাকবেনই। সেই যুবক ঘুরতে ঘুরতে তাঁর জন্মস্থান নাগপুর থেকে এসে পড়লেন সারাগাছি আশ্রমে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী তাঁর পাশে বসালেন যুবককে। কিছু প্রশ্ন করে নাম ধাম ও পারিবারিক বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। তারপর বললেন :

'তুমি এতদিনে এলে! অনেক দেরি হয়ে গেল তোমার। আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, অসুস্থ হয়ে পড়েছি, বেশ পরিশ্রান্ত বোধ করছি। সুতরাং আমি কি তোমাকে আর পথপ্রদর্শন করতে পারব?'

মারাঠি যুবক বললেন :

'স্বামীজী, আপনি আমাকে শুধুমাত্র আপনার সেবা করার সুযোগ দিন। আপনার সেবা করতে পারলে আমি সবকিছুই পাব। উপযুক্ত সময় দেখে আমাকে অনুগ্রহ করলে আমি কৃতার্থ হব।'

স্বামীজী বললেন, 'ঠিক আছে তুমি এখানেই থাকো, তারপর ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা হবে তেমন হবে।'

স্বামীজীর মুখ থেকে এই শব্দ শোনা মাত্র মারাঠি যুবক অত্যন্ত আনন্দ পেলেন এবং সেই মুহূর্ত থেকে সেই সন্ন্যাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। আশ্রমের পূজার সমস্ত দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত করা, ভোগ তৈরি করা, আশ্রম ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, বাসন মাজা, কাঠ চেরাই করা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ অত্যন্ত তৎপরতা সহযোগে করতে থাকলেন প্রাণিবিদ্যায় মাস্টার্স করা সেই মারাঠি তরুণ। দিবারাত্র যখনই সন্ন্যাসী তাঁকে ডাকতেন, তখনই হাতজোড় করে তিনি সেখানে উপস্থিত হতেন। গুরুদেব যুবকের বহু কঠিন পরীক্ষা নিতেন আর সমস্ত পরীক্ষাতে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হতেন তিনি। এভাবেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন হলেন সেই যুবকের প্রতি।

অবশেষে এলো ১৯৩৭ সালের ১৩ জানুয়ারি। মকর সংক্রান্তির শুভ দিন। গুরুদেব দীক্ষা দিলেন তাঁর প্রিয় মারাঠি শিষ্যকে। আর আশীর্বাদ করে বললেন :

'তোমাকে হিমালয়ে যেতে হবে না, পর্বতগুহায় গিয়ে বসতে হবে না, তোমাকে সমাজের কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। এক মহান কাজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য, তুমি যেখানেই যাবে সেখানেই যশ প্রাপ্ত হবে। আর দেখ তোমার এই সুন্দর কেশরাশি আর দাড়ি তোমার মুখমণ্ডলে অপূর্ব শোভা দিচ্ছে— এগুলোকে কক্ষনো তুমি কেটো না।'

এর কয়েকদিন বাদেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী। অনেক ধরনের চিকিৎসা করেও শরীর আর সুস্থ হলো না। উত্তম চিকিৎসার জন্য আশ্রমবাসীরা সন্ন্যাসীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। স্বামীজীকে বেলুড়মঠে নিয়ে আসা হলো। স্বামীজীর নির্দেশে মারাঠি যুবকও এল স্বামীজীর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য। গুরুদেবের পাশে বসে রাতের পর রাত কাটাতেন সেই মারাঠি যুবক। স্বামীজীর সেবার কোনো ত্রুটি রাখতেন না। কিন্তু তবুও মানুষমাত্রই মরণশীল, তাই এসে গেল সেইদিন— ৭ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৩৭ সাল। ইহলীলা সাঙ্গ করলেন সেই সন্ন্যাসী। তবে দেহত্যাগ করবার আগে প্রিয় শিষ্যকে কাছে বসিয়ে উপদেশ দিলেন। স্বামীজীর প্রয়াণ ব্যথিত করল মারাঠি যুবককে। গুরুদেবের নির্দেশে তিনি কামারপুকুর, জয়রামবাটি প্রভৃতি পবিত্র স্থান দর্শন করে, দেড়মাস যাবৎ কলকাতায় থেকে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে ফিরে গেলেন নাগপুর। সেখানে অনেক বড়ো দায়িত্ব অপেক্ষা করছিল যুবকের জন্য। সে দায়িত্বও তিনি কাঁধে নিলেন এবং আমৃত্যু সফলতার সঙ্গে পালন করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য এই সন্ন্যাসী হলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৮৬৪-১৯৩৭), আর মারাঠি যুবক হলেন মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (১৯০৬-১৯৭৩), যিনি শ্রীগুরুজী নামে অধিক পরিচিত।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন ভারতের গ্রামোন্নয়নের পথিকৃৎ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের এই গুরুভাই। আর তাঁর প্রিয় শিষ্য গোলওয়ালকর ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর সঙ্ঘকে পরিচালনা করেছেন তিনি। সঙ্ঘকাজ বিস্তৃত করেছেন সারা ভারতে। তাঁর উৎসাহে তৈরি হয়েছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রভৃতি বহু বিবিধ সংগঠন যা সঙ্ঘের আদর্শকে নিয়ে গেছে অনেক অনেক মানুষের কাছে। দাদরা ও নগর হাভেলির স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, চীন-ভারত যুদ্ধে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে এবং বাংলদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের নিঃস্বার্থ ভাবে পাশে থাকতে, কন্যাকুমারীকাতে বিবেকানন্দ শিলাস্মারক মন্দির নির্মাণ করতে ইত্যাদি নানাবিধ কাজে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং যে আত্মত্যাগ করেছিলেন সেটা স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্য এই শ্রীগুরুজীর অনুপ্রেরণাতেই।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবক সঙ্ঘ— দুটি সংগঠনই বটবৃক্ষের ন্যায় পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত। দুটি সংগঠনের কর্মধারা পৃথক। তবে দুই সংগঠনের আন্তরাত্মা যে এক সেটা বোঝা যায় স্বামী অখণ্ডানন্দজী আর গোলওয়ালকরজীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার এবং তার তাৎপর্য মূল ধারার ইতিহাসে ব্রাত্য। কারণ স্বাধীন ভারতের মূলধারার ইতিহাস লেখা হয়েছে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ইতিহাসে ব্রাত্য হলেও মানুষের হৃদয় জুড়ে যে তাঁরা আছেন সেটা বোঝা যায় এই দুই সংগঠনের বিস্তার দেখে।

উত্তরবঙ্গ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হোক

উত্তরবঙ্গের দুই মন্ত্রীর দাবি যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক করে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে । দাবির পিছনে যুক্তিটা হলো উত্তরবঙ্গ বরাবরই অনুন্নত ও অবহেলিত। প্রশ্ন উঠেছে, আলাদা হলেই কী উন্নতি সম্ভব? আলাদা হওয়াই কি তাহলে উন্নয়নের পথ? প্রশ্ন উঠেছে, সত্যিই কী জনগণের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত তাঁরা?

প্রসঙ্গত, আগেও আলাদা রাজ্য গড়ার দাবি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন থেকে উঠেছে ভারতভুক্তি চুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে। এর ফলে বহু অশান্তি হয়েছে, বনধ হয়েছে। আবার ওই সময় প্রশ্ন উঠেছিল তাহলে বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে আসা বাঙ্গালি হিন্দুরা যাবে কোথায়? এর উত্তর মেলেনি। এদিকে গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে দার্জিলিং-কে আলাদা রাজ্য করার আন্দোলন চলছেই। উত্তরবঙ্গে একটার পর একটা অশান্তি তো লেগেই রয়েছে। প্রশাসনের কড়া হস্তক্ষেপে আপাতত স্বস্তিতে রয়েছি। রাজ্য হলেই যে সবকিছু তরতর করে এগিয়ে যাবে তা নয়। অনেক প্রক্রিয়া আছে, সংবিধান সংশোধন করতে হবে, বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হবে, মন্ত্রী -আমলা বৈঠক হবে, উন্নয়নের খসড়া তৈরি হবে, রাজ্যের রূপরেখা তৈরি হবে ইত্যাদি। উল্লেখ্য, যৌথ পরিবার থেকে যখন কোনো সন্তানকে পৃথক করে দেওয়া হয়, সেই সন্তানকে নতুন করে সংসারের সবকিছু তৈরি করতে হয়। বাপের তৈরি সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন জঙ্গলমহল থেকে আলাদা হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা হয়েছে। জঙ্গলমহলের মানুষেরা কি সুখে আছেন? তারা বলেন, ভোটের সময় শুধুমাত্র নেতাদের জঙ্গলমহলের কথা মনে পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হলে তখন সব কিছু সময় মতো পাওয়া যাবে যেমন--- গোয়া-দমন-দিউ।

অতএব, কেন্দ্র শাসিত হলেই উন্নতির নয়া দিশা দেখাবে, পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ থেকে চোরা পথে উত্তরবঙ্গে ঢুকতে সাহস পাবে না। সেন্ট্রাল ফৌজের কড়া পাহারায় থাকবে বর্ডার। আমাদের রাজ্যের বড়ো সমস্যা হলো রোহিঙ্গা আর জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ। এদের বাড়বাড়ন্তে বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা, বৃদ্ধি পেয়েছে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, বৃদ্ধি পেয়েছে নারী ধর্ষণ, তৈরি হচ্ছে বোমা, পাচার হচ্ছে গোরু, আমদানি রপ্তানি হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গ এখন আগুনের স্তূপে। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রাণাধীন হলে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ হবে। এনআরসি লাগু হবে। তখন ভুয়ো নাগরিকরা অন্য কোথাও পালাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। সেই হেতু সাধারণ শ্রেণীর কথা ভেবে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ তুলে দিতে হবে। যদি সংরক্ষণ প্রথা রাখতেই হয়, তাহলে সব শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা মানবিকতার পরিচায়ক। সংরক্ষণ তৈরি করে বিভেদ। এই বিভেদ থেকে বেরিয়ে এসে হতদরিদ্র সব শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের বিনা পয়সায় লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য চাকরির সুযোগ করে দিতে হবে, কলকারখানা নিয়ে আসতে হবে। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য বেতন ও বোনাস, রেশন ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

সম্প্রতি, আফগানিস্তানে আমরা হিংস্র তালিবানদের নৃশংসতা দেখছি। শিয়া সুন্নির যুদ্ধ চলছে। আফগানিস্তান থেকে বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। তালিবানরা বলছে, কেউ যাবেন না আমরা নিরাপত্তা দেব, আবার পরক্ষণেই শোনা যাচ্ছে ওরাই নিরাপরাধীদের হত্যা করছে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তানের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আমরা হিন্দুরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। উত্তরবঙ্গ অলাদা জেলা হলে ভারত কেশরীর স্বপ্ন তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিনম্র নিবেদন, আলাদা রাজ্য নয়, উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা হোক। তাহলে শ্যাম ও কুল দুটিই বজায় থাকবে।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

ভবানীপুরের উপনির্বাচনেই কী উত্থান পতনের ইতিহাস লেখা হবে?

মন্ত্রটি লিখে ও মনে রাখা ভালো, জানি না কখন ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে স্বঘোষিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই দেবী দুর্গার পুজো মন্ত্রকে বিকৃত করে আবার ব্যবহার করবে। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি বারে বারে অপ্রীতিকর সমালোচনা মূলক বক্তব্য রেখেছেন তাঁর পক্ষ থেকে দেবী দুর্গার মন্ত্র বিকৃত করে পেশ করা এমন কিছু অবাক করা ব্যাপার নয়। ভবানীপুরের উপনির্বাচন আক্ষরিক অর্থে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচারেরর মধ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিমের প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে নিয়ে করা মন্তব্যে এটা পরিষ্কার যে তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালো করেই টের পাচ্ছে, ভবানীপুরের ভোটের ফলাফল তাদের আগামীদিনের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা ২০২১-এ বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান স্বীকার করে হেরে বসে থাকা মমতা ব্যানার্জিও ভবানীপুরের এই উপনির্বাচনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। যার জন্য প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের মতো প্রার্থী যাকে কিনা দলের নেতারা চেনেনই না বলছেন, তাকে পরাস্ত

করতে মমতা ব্যানার্জিকে মসজিদ থেকে মল্লিকবাড়ির জামাইয়ের দুয়ার অবধি ছুটতে হচ্ছে।

প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের ভবানীপুরের উপনির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়েও অনেকেই অনেক মহল থেকে অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়া জানালেও এই মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জির মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং পরিস্থিতির নিরিখে সঠিক প্রার্থী। যে কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামার আগে সমাজের বুকে প্রার্থীর অবদান এবং সামাজিক বিষয়ে ও কাজে প্রার্থীর যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র পদের উপরে ভর করে ভোটে জেতা কিংবা মানুষের কাজ করা যায় না, তার চাক্ষুষ প্রমাণ বিজেপি, তৃণমূল, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেই রয়েছে। ভোট-পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরাতে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের দায়ের করা মামলা এবং সেই মামলায় ঘরছাড়া নির্যাতিত বিজেপি কর্মী ও তদের পরিবারের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের সদর্থক রায় প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের গ্রহণযোগ্যতা অনেক অংশে বাড়িয়েছে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তিনি এক চেনা ও আলোচ্য মুখ হয়ে উঠেছেন।

অন্ততপক্ষে এ রাজ্যের কোনায় কোনায় পড়ে থাকা বিজেপি কর্মী যাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতিনিয়ত চলতে থাকে মিথ্যে মামলায় ফেঁসে যাওয়ার ভয়, তাদের কাছে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল যেন হয়ে উঠেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নির্যাতন থেকে রক্ষাকারী একমাত্র মাতৃমূর্তি।

মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের মতো দাপুটে রাজনীতিবিদদের সাফল্যের সিঁড়ি চড়তে বেশিদিন সময় লাগে না এই কথাটিও অস্বীকার করা যায় না কোনোমতেই। প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল এই উপনির্বাচনে না দাঁড়ালেও, কলকাতা হাইকোর্টে মামলা না লড়লেও একদিন না একদিন এই দাপুটে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উত্থান অবশ্যম্ভাবী ছিল।

ভবানীপুরের উপনির্বাচনে যদি স্বঘোষিত সর্বভারতীয় তৃণমূল দলের সর্বোচ্চ নেত্রী এবং দু'বার এর মুখ্যমন্ত্রী পদ সামলানো দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা ব্যানার্জি যদি প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে হারাতে এলাকায় এলাকায় রাজনৈতিক গুন্ডাদের নিয়ে সন্ত্রাস চালান, তাহলেও ভোটের ফলাফল ছাড়াই প্রিয়াঙ্কার তথা বিজেপির নৈতিক জয় হবে সেটা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। আবার অন্য হিসেবে বলতে গেলে মমতা ব্যানার্জিকে কমপক্ষে ৫০ হাজার ভোটে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে পরাস্ত করতেই হবে, তা না হলে স্বাভাবিকভাবেই স্বঘোষিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভবানীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বঘোষিত সর্বভারতীয় তৃণমূল দলের সর্বোচ্চ নেত্রী এবং দুইবার মুখ্যমন্ত্রী পদ সামলানো দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ব্যক্তিত্বের ভারের কোনো তফাতই থাকবে না।

যদিও ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে নিজেদের পুরনো ময়দান হিসেবেই দেখছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, কিন্তু তার সঙ্গে এই কথাটিও ভুললে চলবে না যে বিগত ১০ বছরে বেকারত্বের হার কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছে। বহু বছর কেটে গেলও নতুন শিল্পের আবির্ভাব হয়নি, সরকারি চাকরির পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের উদাসীনতা খুব সহজেই চোখে পড়ে। এসএসসি, পিসিএস পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের অধারাবাহিকতা গোটা রাজ্য-সহ দেশের মানুষকে অবাক করে। বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া, সিন্ডিকেটের দাপুটে বাড়বাড়ন্ত, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, ভবানীপুরের মানুষের কাছে কোনো কিছুই অজানা নয়। আপাতদৃষ্টিতে ২০২১-এর বিধানসভার ফলাফল ঘোষণা হয়ে সরকার গঠন হলেও পশ্চিমবঙ্গের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ ভবানীপুর বাসিন্দাদের ভোটদানের উপরই নির্ভর করছে। কারণ ভবানীপুর নির্বাচনের ফলাফলে নিমেষে পালটে যেতে পারে রাজনৈতিক মহলের অনেক সহজ কঠিন সমীকরণ।

—**চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত,** ঘোড়াধরা, ঝাড়গ্রাম।

ইতিহাস-বিকৃতি

গত মাসের ৫ তারিখের একটি বাজারি পত্রিকায় উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধে এক লেখিকা লিখেছেন : 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছিলেন মুসলিম লিগেরই হাত ধরে।' ১৯৪১ থেকে ৪৩— অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশে এই দুই বিরুদ্ধ মেরুর মন্ত্রীসভায় ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী... আর ফজলুল হকের ডেপুটি ও অর্থমন্ত্রী হন শ্যামাপ্রসাদ। লেখিকা ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে ফজলুল হক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু যে সময় সিডব্লুউসি-র সিদ্ধান্ত ছিল, কংগ্রেস কোনও প্রদেশে কারও সঙ্গে কোয়ালিশনে যাবে না। ফলে, ১৯৩৭ সালে ফজলুল হককে মুসলিম লিগের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়েছিল। সেই সরকারের মন্ত্রীসভায় নলিনী সরকার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। হুমায়ুন কবীর শ্যামাপ্রসাদকে ওই মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম লিগের তীব্র বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। মুসলিম লিগের অসহযোগিতার কারণে ফজলুল হকের সেই কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেলে, তিনি মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে ৪১-এর ডিসেম্বরে যে নতুন সরকার গঠন করেছিলেন, 'শ্যামা-হক' বলে খ্যাত হক সাহেবের সেই দ্বিতীয় দফার সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, ১১.১২.১৯৪১ থেকে ২০.১১.১৯৪২ সাল পর্যন্ত। (তথ্যসূত্র : 'a phase in the life of Dr. Syamaprasad Mookerjee 1937–1946' Dr. Anil Chandra Banerjee; 'বইসংহার এবং'—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

একটি 'প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক' বলে ঘোষিত পত্রিকায় ইতিহাসের বিকৃতিসাধন দুর্ভাগ্যজনক। উল্লেখ্য, 'তথ্য সঠিক নয়' শীর্ষক একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলাম। পত্রটি প্রকাশিত হয়নি।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,** কলকাতা-৬০।

খুশি থাকুন সহজেই

বৃষ্টি মজুমদার

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আপনার পাশের বন্ধুটি সব সময়েই হাসিখুশি থাকে, প্রাণবন্ত থাকে। আর আপনি গালে হাত দিয়ে বসে ভাবেন মেয়েটি এত হাসিখুশি থাকে কীভাবে? ওর জীবনে কি কোনও সমস্যা নেই? যত সমস্যা আমার? একদম না, এসব ভুল ভাববেন না। তাতে সময় নষ্ট আর মনকে কষ্ট দেওয়া— দুই-ই বাড়বে। খুশি কীভাবে থাকবেন তা নির্ভর করছে আপনার উপরই। কীভাবে থাকবেন তার কিছু উপায় বলে দেওয়া যেতেই পারে। চেষ্টা করুন, ফল পাবেনই।

শুভেচ্ছাকে আমল দিন। ধরুন আপনি অফিসে একটা প্রজেক্ট করলেন। বহু সহকর্মী আছেন যারা সত্যি সত্যি আপনার প্রশংসা করবেন। আর কেউ কেউ থাকবেন যারা আপনার নেতিবাচক দিকগুলি নিয়েই শুধু আলোচনা করবেন। মনে রাখবেন, সমালোচনা আর নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা কিন্তু এক নয়। আপনার প্রজেক্টের ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নিন। শুধু নেতিবাচক কথাগুলো নিয়ে অযথা ভাববেন না। ইতিবাচক কথাগুলোকে আঁকড়ে ধরুন। দেখবেন পরের কাজগুলো আরও মন দিয়ে করতে পারছেন।

সাংস্কৃতিক কাজে নিজেকে যুক্ত করুন। সারাদিন অফিসে খাটাখাটি করছেন আপনি। নিজের কেরিয়ার নিয়ে খুব ব্যস্ত। মানছি, কিন্তু একটু বিশ্রামেরও দরকার। পাশাপাশি কিছু সাংস্কৃতিক কাজকর্ম নাচ-গান-থিয়েটারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন। আঁকতে যদি ভালো লাগে তাই করুন। হতেই পারে সপ্তাহান্তে একদিন নিজের বাড়িতে আর্টবুটিক খুললেন। বিভিন্ন শো পিস বিক্রি করছেন। এইসব কাজের মধ্যে থাকলে মন ভালো থাকবে।

নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ বাছুন। এটা বলা খুব কঠিন। কারণ আমরা সকলেই সারাদিন যত রকমের কাজ করি না কেন সবটা নিজের পছন্দমতো হয়ে উঠতে পারে না। তাই দিনের মধ্যে কিছু সময় নিজের পছন্দমতো কাজের জন্য রাখুন অথবা সপ্তাহের শেষে কিছুটা সময় রাখুন। ধরা যাক আপনি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ভালোবাসেন অথবা ছোটো ছোটো জায়গায় ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন। ঘুরে আসুন। নিজেকে ভালো রাখার জন্য ছকে বাঁধা জীবনের বাইরে পা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

মেডিটেশন। সারাদিনের শেষে প্রতিদিন একটু মেডিটেশন করুন। সকালে তো বেরোনোর তাড়া থাকে। তাই তা সম্ভব নয়। বরং রাতে শোয়ার আগে কম করেও ১০ মিনিট ধ্যান করুন। মনটাকে একাগ্র করুন। দেখবেন ভালো ঘুম হবে আর শরীর ও মন দুই-ই খুব সতেজ লাগবে। এই তরতাজা ভাবটাই আপনাকে সারাদিনের জন্য অক্সিজেন জোগাবে।

অন্যদের জন্যও খরচ করুন। সারাদিন খাটাখাটনি করে শুধু নিজের জন্য টাকা রোজগার করছেন আর নিজের জন্যই খরচ করছেন দু'হাতে— এটা ঠিক নয়। কাছের মানুষদের জন্যও খরচ করুন। দেখবেন প্রিয়জনদের জন্য খরচ করলে ভালোই লাগবে। সঙ্গীকে বা বন্ধুদের ছোটো ছোটো উপহার দিন। মা-বাবা, স্বামী অথবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গিয়ে রেস্তোঁরায় খাওয়ান। বিল পেমেন্ট করার সময় দেখবেন ভালো লাগছে।

পর্যাপ্ত ঘুম। ঠিকমতো ঘুম না হলে হাসখুশি থাকা সম্ভব নয়। টানা সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমান। মেয়েদের আরও বেশি ঘুমের প্রয়োজন। টানা ঘুম থেকে উঠলে দেখবেন কাজের এনার্জি পাচ্ছেন।। আর মনটাও খুব ভালো থাকবে। ঘুম ভালোভাবে হলে সারাদিনে কাজের একটা আলাদা উৎসাহ পাবেন। সহজে রাগ বা খিটখিটে মেজাজ হবে না।

পরিবারে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করুন। আজকাল ব্যস্ততার যুগে পরিবারের সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার সুযোগ কোথায়? অফিসে নিজের ডেস্কেই লাঞ্চ সারছেন আবার বাড়িতে ফিরে রাতের খাবার গরম করে নিয়ে খাচ্ছেন। এটা রোজকার রুটিন। এর থেকে বেরিয়ে আসুন। প্রতিদিন না পারেন অন্তত সপ্তাহের একদিন পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে খান। অফিসেও সহকর্মীদের সঙ্গে টিফিন করুন।

নিজেকে নিয়ে ভাবুন। এটা নিজের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বা রোস্তোঁরায় বসে সম্ভব নয়। বরং এমন কোনও জায়গা বেছে নিন যেখানে আপনি নিরিবিলিতে বেশ কিছুক্ষণ কাটাতে পারবেন। একদম একা। এবার নিজের গত ছয়মাসের রেকর্ড হাতড়ান। দেখুন আপনার নিজের পারফরমেন্স কেমন। খুব নিরপেক্ষভাবে এটা অনুধাবন করুন, যেন আপনি অন্যের কাজের বিশ্লেষণ করছেন। নিজের ভুলত্রুটি অথবা ভালো কাজগুলো একসঙ্গে একটি খাতায় লিখে ফেলুন। কোন কাজগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন, আর কোনগুলোকে দেননি সবই লিখবেন। এর পরের ছয়মাসের একটা লগবুক ঠিক করুন। সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভাগ করুন। কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে নিজেকে একটা গিফট দিন। দেখবেন, খুঁজে পাবেন নিজেকে খুশি রাখার এক অসাধারণ উপায়। ▯

জায়ফলের বিভিন্ন উপকারিতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের দেশে রান্নায় আলাদা মাত্রা যোগ করার জন্য জায়ফলের ব্যবহার হয়। কেননা এর মধ্যে আছে একটা মিষ্টি স্বাদ। তবে এর নানারকম ঔষধি গুণও আছে। মশলাটি প্রথম পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়াতে। কখনও গোটা জায়ফল আবার কখনও এর গুঁড়ো ব্যবহার করা হয় রান্নায়। একঝলক দেখে নেওয়া যাক এর কী কী উপকারিতা আছে :

১. ব্যথা কমায়। জায়ফলের মধ্যে নানারকম এসেনশিয়াল অয়েল আছে যেমন মাইরিসটিসিন, এলিমিসিন, ইউগেনোল, স্যাফ্রোল। এগুলির প্রতিটিরই প্রদাহনাশক ক্ষমতা আছে যা অস্টিওআথ্রাইটিস, রিডম্যাটিয়েড আথ্রাইটিসে অস্থিসন্ধির ব্যথা বা ফোলা দুটোই কমায়। জায়ফল থেকে তৈরি হওয়া তেল কয়েক ফোঁটা নিয়ে ব্যথার জায়গায় লাগালে ফোলা, লালচে ভাব ও ব্যথা কমবে।

২. অল্প পরিমাণে জায়ফল খেলে ইনসোমনিয়া কমায়। ঘুম আসতেও সাহায্য করে। ঘুম আসার পাশাপাশি এর ভিতরকার বিভিন্ন যৌগ মনকে উৎকণ্ঠামুক্ত রাখতেও সাহায্য করে। সেজন্য প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে। গরম দুধে খানিকটা জায়ফল গুঁড়ো যোগ করে খেতে হবে। চাইলে কিছু আমন্ড বাদাম আর দারুচিনি পাউডারও এর মধ্যে দিতে পারেন। ঘুম ভালো হবে। আস্তে আস্তে ইনসোমনিয়ার সমস্যা কেটে যাবে। তবে একদিনেই ফল পাবেন না, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করতে হবে।

৩. এই মশলাটি আমাদের হজম ঠিকঠাক হতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই আপনার হজম বা পেটের কোনও সমস্যা যদি হয়, যেমন— ডায়েরিয়া, পেটফাঁপা, গ্যাস তাহলে ঘরোয়া সমাধান হিসেবে স্যুপ বা স্টু-তে জায়ফল বা এর গুঁড়ো যোগ করতে পারেন। এর মধ্যে পর্যাপ্ত ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। তবে ডায়ারিয়া হলে সেটা সারিয়ে নিয়ে জায়ফল খেতে হবে। পেটে অতিরিক্ত গ্যাস হয়ে গেলে তা কমাতেও এটি সহায়ক।

৪. মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রাখে সুরক্ষিত, মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলিকে উদ্দীপনা জোগায় জায়ফল। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় ব্রেন টনিক হিসেবে জায়ফল ব্যবহৃত হতো। অবসাদ, উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি, মানসিক চাপ কাটাতে এটি সহায়ক। মনের মধ্যে যখন অতিরিক্ত স্ট্রেস চলছে, তখন সামান্য একটু জায়ফলেই আমাদের রক্তচাপ কমে যায়। ফলে শরীর জুড়ে অস্বস্তি হয় না। এটি মুডের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে মনকে উদ্দীপনা জোগায়।

৫. মুখের দুর্গন্ধ কমায়। মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে? হতে পারে আপনার শরীরে টক্সিনের পরিমাণ খুব বেড়ে গেছে যা আপনার শরীর হয়তো এভাবে জানান দিচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও সঠিক ডায়েট মেনে না চললে শরীরে টক্সিনের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। জায়ফল শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়ার কাজটি করে। তবে নিজে করে না। লিভার ও কিডনিকে এই কাজ করতে সাহায্য করে। এর এসেনশিয়াল অয়েল অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকায় এটি মুখ থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর করতেও সাহায্য করে, আয়ুর্বেদিক টুথপেস্ট আর গাম পেস্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই জায়ফলের ইউগেনোল এসেনশিয়াল অয়েলটি দাঁতে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে।

৬. ত্বকের লাবণ্য ফেরায় এর মধ্যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি গুণ থাকায় এটি ত্বকের লাবণ্য ফেরায়। এটি ত্বকের ব্লাকহেডস ও অ্যাকনে দূর করে ত্বকের ছিদ্রগুলি খোলে, যার মাধ্যমে ভিতরকার তেল-ময়লা বাইরে বের হয়ে আসে। মধুর সঙ্গে জায়ফলের গুঁড়ো মিশিয়ে অ্যাকনেতে লাগালে ব্রণর সমস্যা কমবে। ওটমিল, কমলালেবুর খোসার সঙ্গে জায়ফলের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগালে স্ক্রাবার হিসেবে দুর্দান্ত কাজ করে।

৭. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিনারেলস যা রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর ফলে রক্ত সরবরাহও স্বাভাবিকভাবে হয়। এর ফলে রক্তসঞ্চালনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে ধমনি বা শিরার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। রক্তবাহী ধমনিকে প্রশস্ত করে ও হার্টকে স্বাভাবিক ছন্দে কাজ করতেও সাহায্য করে।

(লেখক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)

বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকবেন ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

এক ১২ বছরের বালক। বয়সে ছোটো হলে কী হবে ভয় ডর কাকে বলে জানে না। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে। বড়োরাও এক একসময় তার জেদের কাছে হার মানে। একদিন তারই চোখের সামনে ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা। তার বড়ো ভাই হঠাৎই কয়েকদিনের অসুখে মারা গেলেন। তারপর আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী মিলে তার আদরের বউদিকে 'সতী' করার তোড় জোড় শুরু করল। কাঠের চিতা সাজানো হলো। আগুনের লেলিহান শিখা যখন সারা আকাশ ঢেকে ফেলল কালো ধোঁয়ায় তখন সকলে মিলে তাকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে চলল সেই চিতার দিকে। তখন বউদির সে কী আর্তচিৎকার। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। সকলে মিলে তাকে ছুঁড়ে ফেলল সেই আগুনে। সর্বগ্রাসী চিতার মধ্যে দু' একবার হাত-পা ছুঁড়ে— অবশেষে নিস্তেজ হয়ে গেল। চারিদিকে তখন ঢাক-ঢোল- কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ। এই বালকটি শুধু কেঁদেই চলছিল। চিতার আগুনে বউদির শরীর যখন পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে তার চোখের জলও শুকিয়ে গেল। সে জল পরিণত হলো রাগ, ক্ষোভ আর প্রতিশোধের শপথে। ওই চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন সে প্রতিজ্ঞা করল যে বড়ো হয়ে দেশ থেকে এই নৃশংস 'সতীদাহ' প্রথা সে নির্মূল করবেই করবে। করেও ছিল। একদিন ওই ছেলেই বড়ো হয়ে আধুনিক ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায় নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। যার নিরন্তর সংগ্রামের ফলে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন পাশ করে ওই নারকীয় 'সতীদাহ' প্রথম এদেশ থেকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু রামমোহন তাঁর জীবদ্দশায় (১৭৭২-১৮৩৩) নারী মুক্তির সব কাজ করে যেতে পারেননি। তিনি ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই আর এক বাঙ্গালি সমাজ সংস্কারক তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি হলেন আমাদের সকলের পরিচিত বাঙ্গালির আত্মার আত্মীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রায় ৮০০ বছরের মুসলমান শাসনে ভারতের হিন্দু সমাজের চির নির্মল প্রবহমান ধারা অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হয়েছিল। বাল্যবিবাহ, কুলীন প্রথা এবং তার হাত ধরে সতীদাহের মতো ঘৃণ্য আচারে হিন্দু সমাজ যখন নিমজ্জিত, ঠিক তখনই যেন ভগবানের নির্দেশে এই সমাজের কলুষ মুক্তির জন্যে আবির্ভূত হলেন দুই মহামানব— একজন রাজা রামমোহন রায়, আর অন্যজন বিদ্যাসাগর। প্রথমজন বিধবা নারীদের বলপূর্বক চিতায় পুড়িয়ে মারা 'সতীদাহ' থেকে নিষ্কৃতি দিলেন, আর দ্বিতীয় জন স্বামীহারা বিধবা কন্যাকে পুনর্বার বিবাহ করার অধিকার দিয়ে— তাদের স্বামী-পুত্র-কন্যা-পরিবার নিয়ে সুখে সংসার করার দিলেন অধিকার— 'বিধবা বিবাহ আইনে।'

ইসলামি আগ্রাসনের আগে এদেশে সতীদাহ, বালিকা বিবাহ বা গৌরীদান প্রথা কোনো কালেই ছিল না। সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে, মাতা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে, দ্রৌপদী অর্জুনকে বা যশোধরা গৌতম বুদ্ধকে পূর্ণ যৌবনা হয়েই পতিরূপে বরণ করেছেন। মহামতি অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শালিবাহন, হর্ষবর্ধন— এরা কেউই বালিকাবধূ ঘরে আনেননি। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইসলাম আক্রমণের পর তাদের প্রথম লক্ষ্যবস্তুই হয়ে উঠেছিল মঠ-মন্দির ও নারী। নারী লোলুপ মুসলমানের হাত থেকে পরিবারের কন্যাদের বাঁচাতে প্রচলন হলো গৌরীদান বা বাল্যবিবাহের। ছয় থেকে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাদের কোনোক্রমে বিবাহ দিতে পারলে হয়তো তারা ওই নরাধমদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পাবে— এই ছিল উদ্দেশ্য। ঘরের মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে অন্ধকূপে ঢুকে পড়ল হিন্দু সমাজ। তার সঙ্গে সঙ্গে এল বহু কু-আচার। এর হাত ধরে এল কুলীন বিবাহের মতো ঘৃণ্য রীতি। জীবন হারা পরাধীন জাতি পদে পদে জীর্ণ কু-আচারে পরিপূর্ণ হলো। অর্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী সমাজপতিরা নতুন শ্লোক আবিষ্কার করল—

‘বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।’ প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, তস্যবৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে ৫/৮/১০ বছরের শিশুকন্যার বিয়ে হতে লাগল। এমন অবস্থাও হলো যে কুলীন ব্রাহ্মণেরা শত শত বিয়ে করে স্ত্রীদের নাম ধাম মনে রাখতে না পেরে তালিকা করে রাখতো। অল্পদিনের মধ্যে স্বামীর অকাল প্রয়াণ বা বয়সোচিত কারণে মৃত্যু হলে সেই শিশু-বালিকা- তরুণী বিধবার জীবনে নেমে আসতো ‘সতী’ নামক মৃত্যুর পরোয়ানা। যদিও-বা রাজা রামমোহন তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের দ্বারা এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে আনলেন কিন্তু সেই বিধবারা বাকি জীবন কীভাবে কাটাবে তার কোনো সদুত্তর হিন্দু সমাজবেত্তারা দিতে পারলেন না। সারা জীবন নিরামিষ, একাদশী, উপবাস, ঘোমটা— এই বদ্ধ পরিবেশে দিন কাটানোই ছিল তাদের ভবিতব্য।

এর বিরুদ্ধেই লড়াই করেছিলেন বিদ্যাসাগর। মনুষ্যত্বহীন লোভী সমাজপতিদের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ‘আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণ সমাজের মাথায় পা রেখে বলছি এই বিধবা বিবাহ আইন আমি আমার জীবদ্দশায় পাশ করাবই করাবো। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। আমার বাড়ির মাতা, ভগিনী, কন্যাদের আমি মুক্তি দেবই।’

সালটা ছিল ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। ঠাকুরদাস বাঁড়ুজ্যে সেদিন পাশের গাঁয়ে কাজ সেরে ফিরছেন। বাড়ির উঠোনে বাবা রামজয়ের মুখোমুখি। ‘কোথায় ছিলি এতক্ষণ, তাড়াতাড়ি ঘরে যা। দেখ একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।’ সত্যিই ঘরে একটা আসন্ন প্রসবা গাভী ছিল। ঠাকুরদাস ভাবলেন সেই গাভী বুঝি বাচ্চা দিয়েছে। ছুটলেন গোয়ালে। গিয়ে দেখেন— না, গাভী তো দিব্যি খড় চিবোচ্ছে। বাছুরের নামগন্ধ নেই। গোয়াল থেকে বেরুতেই বাবা হেসে বললেন, ‘ওরে ওদিকে নয়, এদিকে’— বলে আঁতুড় ঘরের দিকে ইশারা করলেন। ঠাকুরদাস আঁতুড়ঘরে ঢুকে দেখলেন তার সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে। আনন্দের আর সীমা রইল না। দাদু রামজয় নাতির নামকরণ করলেন ‘ঈশ্বরচন্দ্র’, কিন্তু দাদুর সেদিনের উপহাস মিথ্যা হয়নি। এঁড়ে বাছুরের মতো একরোখা স্বভাবই ভবিষ্যতের ঈশ্বরকে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল।

বাবা ঠাকুরদাস কর্মসূত্রে থাকতেন কলিকাতায়। মা ভগবতীদেবী কোনোমতে কষ্টেশিষ্টে সংসার চালাতেন। একবার তাঁর খুব অসুখ। ঈশ্বর সাধ্যমতো মায়ের সেবা যত্ন করল।

যতদিন বাঙ্গালি বেঁচে থাকবে ততদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগরও বেঁচে থাকবেন। তিনি বেঁচে থাকবেন শিশুর ‘বর্ণপরিচয়’ ‘ঋজুপাঠে’; বেঁচে থাকবেন শিক্ষাব্রতীদের ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ আর ‘সংস্কৃত উপক্রমণিকায়’; বেঁচে থাকবেন শিক্ষার গল্প ‘কথামালা’ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’তে; বেঁচে থাকবেন ভারত আত্মার জ্ঞান আহরণ ব্রতীদের ‘শকুন্তলা’ ‘সীতার বনবাস’, ‘ভ্রান্তি বিলাসে’; আর বেচে থাকবেন নারীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে— যাদের জন্য বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন।

ছোট্ট হাতে পথ্য তৈরি, ওষুধ খাওয়ানো সব যেন তারই দায়িত্ব। সেদিন মায়ের হাত পা টিপে দিতে দিতে বলল, ‘মা, তোমার হাতে একটাও বালা নেই। কিন্তু গাঁয়ের মেয়েদের গায়ে কত সুন্দর সুন্দর গয়না।’ মা বললেন, ‘আমি গয়না পরলে তুই খুশি হবি?’ ছেলের উত্তর, ‘হবো না? গয়না পরলে সুন্দর মানায় যে। আমি বড়ো হয়ে চাকরি করলে তোমার হাতে, কানে আর গলায় তিনটে গয়না গড়িয়ে দেব।’ মা বলেন, ‘ঠিক তো? বড়ো হয়ে আমায় তিনটে গয়না গড়িয়ে দিবি?’ ছেলে বলে, ‘দেবইতো।’ মা হেসে বলেন, ‘তিনটেই চাই কিন্তু। তবে সে গয়না সোনার নয়। আমার পছন্দমতো।’ ঈশ্বর অবাক, ‘সোনার নয়! তবে কীসের?’ মা বলেন, ‘আমার প্রথম গয়না হলো একটা স্কুল। গাঁয়ের গরিব ছেলেদের পড়াশুনার জন্য একটা ভালো স্কুল চাই বাবা। পাঠশালার পর তাদের আর পড়াশোনা হয় না। তারা সবাই পড়াশোনা করে বড়ো হোক---এ আমার বহুদিনের সাধ।’ হতাশ ছেলের প্রশ্ন, আর দ্বিতীয়টা? এ গাঁয়ে কোনো হাসপাতাল নেই। রোগ হলে হয় কবিরাজের পাঁচন, নয় ভগবান ভরসা। তুই আয় করলে এ গাঁয়ে একটা হাসপাতাল গড়ে দিস যেখানে পাঁচ গাঁয়ের লোক বিনি পয়সায় চিকিৎসা পাবে।’ ঈশ্বর বলে, ‘ঠিক আছে ও দুটো না হয় হবে। এবার অন্তত একটা সত্যিকারের গয়না চাও’, মুচকি হেসে মা বললেন, ‘নেবই তো। আমার শেষ গয়না হলো— এ গাঁয়ের বেশিরভাগ লোক বড্ড গরিব, দুবেলা পেট পুরে খেতেই পায় না। যদি বড়ো হয়ে ভালো উপায় করিস তবে এদের পেট ভরে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিস।’ ঈশ্বর অবাক, বললে, ‘কিন্তু তুমি যে নিজের জন্য কিছুই নিলে না।’ মা বলল, ‘কে বলে নিইনি? এগুলো সবই তো আমার জন্য। এগুলো করলে জানবি আমাকেই দেওয়া হলো।’ এমনই ছিলেন ঈশ্বরের মা— দয়ার সাগরের গর্ভধারিণী ভগবতীদেবী।

গ্রামের পাঠশালায় পড়া শেষ করে বাবার সঙ্গে ঈশ্বর এল কলকাতায়। উঠল বড়োবাজারে বাবার কর্মস্থল জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ি। ভর্তি হলো সংস্কৃত কলেজে। বাবা সারদিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে রাত্রি নটায় রান্না করে ঈশ্বরকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। ভোর রাতে ঘুম থেকে তুলে দিতেন পড়ার জন্য। শুরু হলো কঠোর সাধনা। ঘুমের ঢুলুনি থেকে বাঁচতে চোখে সরষে তেল লাগিয়ে নিতেন, তেলের জ্বালায় ঘুম পালাতো। আবার কখনও-বা জানালার রডে বা কড়িকাঠে টিকি বেঁধে পড়তে বসতেন— ঘুমে ঢুলে পড়লে চুলে টান লেগে ঘুম ভেঙে যেত। কতদিন রাতে লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে গেলে রাস্তার গ্যাসের বাতিতে নিজের পড়া করে নিয়েছেন তার হিসাব নেই। পরীক্ষার ফল এত ভালো হলো— পাঁচ টাকা বৃত্তি পেল ঈশ্বর।

আট-ন’ বছরের শিশু, কতদিনই-বা মাকে ছেড়ে থাকবে। ঠাকুরদাস ক’দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেন। মাকে দেখেই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঈশ্বর। মা আদরে আদরে ভরিয়ে দিলেন তাকে। মা দেখলেন ছেলের কাঁধে একটা বড়ো পুঁটলি। জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে এতে কী আছে?’ ঈশ্বর বললে, ‘মা, আমি পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে বেশ কিছু কাপড় কিনে এনেছি। তুমি যদি বলো মা, এগুলো গাঁয়ের গরিব ছেলেদের দিয়ে দিই।’ মা বললেন, ‘এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে বাবা? গরিব দুঃখীকে যে দেখে, ভগবান তাকে দেখে।’ মায়ের অনুমতি পেয়ে সেদিনই গাঁয়ের ছেলেদের জড়ো করে কাপড় বিলি শুরু হলো। বিতরণ শেষ, সকলে নতুন পোশাক পেয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি চলে গেল। হঠাৎ গাঁয়েরই এক গরিব খোঁড়া ছেলে কেঁদে এসে পড়ল সেখানে— সকলে কাপড় পেল, আমি পাব না? আমাকেও একটা কাপড় দাও। ঈশ্বর বললে, ‘তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? সব কাপড়ই যে শেষ।’ ছেলেটির করুণ চাউনি— ‘তবে আমি পাব না?’ ঈশ্বর কী যেন খানিক ভাবল, বলল, ‘তুই এখানে দাঁড়া, তুইও পাবি, আমি তোর কাপড় আনছি’, বলেই দৌড়ে ঘরে গেল। মুহূর্তে একটা পাট করা কাপড় এনে তার হাতে দিয়ে বলল, ‘এটা নে ভাই। এটাও

নতুন। আমি একবার মাত্র পরেছি। এটা তোর।' ছেলেটির তখন কী আনন্দ। নতুন কাপড় পেয়ে খুশি মনে লাঠিতে ভর দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। ঈশ্বরের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

১৮৩৪ সাল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে মায়ের ইচ্ছায় ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ঈশ্বরের। সঙ্গে চলতে থাকল কঠোর অধ্যয়নও। ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপক মণ্ডলী একমত হয়ে সর্বশাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করলেন। ঠিক এই সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হলো। মিস্টার মার্শাল তাঁকে এখানে ইংরেজ সাহেবদের ভারতীয় শিক্ষা দেওয়ার ভার দিতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর গ্রহণ করলেন সেই দায়িত্ব। বিনিময়ে মার্শাল সাহেবকে তিনি বিভিন্ন জেলায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল খোলার অনুমতি চাইলেন। মার্শাল সাহেব মেয়েদের স্কুল খুলতে ইতস্তত করলেন, বললেন, 'বলছেন কী? আপনাদের এই পর্দানশীন দেশে মেয়েদের স্কুল? বিদ্যাসাগর বললেন, 'আপনারা সুসভ্য জাতি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মাতৃজাতি অশিক্ষিত থাকলে দেশ থেকে কুপ্রথা দূর হবে না।' মার্শাল বললেন, 'কিন্তু আমরা কী করব? আপনাদের সংস্কৃত পাঠশালায়, যেখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের ছেলেদের সংস্কৃতই পড়তে দেওয়া হয় না, সেখানে তো স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।' বিদ্যাসাগরের দৃপ্ত উত্তর, 'এই দুই প্রথাই আমি দেশ থেকে নির্মূল করতে চাই, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।' আশ্বাস দিলেন মার্শালসাহেব, শুরু হলো জেলায় জেলায় বালক- বালিকাদের স্কুল খোলার প্রস্তুতি।

বীরসিংহ থেকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে এক অখ্যাত গ্রাম। সেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত বাচস্পতি মশাইয়ের বাড়ি। প্রবল দারিদ্র, ঘরে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। স্ত্রীর নিত্য গঞ্জনা, 'যদি সংসার চালাতে নাই পারো, তবে সংসার করা কেন? জমিদারের কাছে যাও। কিছু অর্থ চেয়ে আনো, সংসার বাঁচুক।' তাঁর উত্তর, 'সে কী কথা, আমি তার কাছে কোন মুখে চাইব? আমি তো তাঁর থেকে কোনো টাকাই পাই না। ব্রাহ্মণী, দুঃখ কষ্ট মানুষে জীবনে আসে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে যে লোভ করতে নেই। তাইতো ব্রাহ্মণ সবার পূজ্য।' ঠিক এমনই সময় দরজায় ডাক— 'বাচস্পতিমশাই আছেন নাকি?' এসে দেখেন দোরে বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে। আদর করে ঘরে বসালেন তাঁকে। দু' এক কথার পরে বিদ্যাসাগর বললেন, 'আজই যে আপনাকে

বিদ্যাসাগর ও মা ভগবতীদেবী

কলকাতায় রওনা দিতে হবে। সংস্কৃত পাঠশালায় ব্যাকরণের পদ খালি হয়েছে। ওই পদে সাহেবরা আপনাকে মনোনীত করেছেন।' বিস্মিত বাচস্পতিমশাই। বললেন, 'কিন্তু আমি তো শুনেছি ওরা ও পদে তোমাকে মনোনীত করেছিল।' বিদ্যাসাগর বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু আপনি থাকতে আমি কি ওই পদ গ্রহণ করতে পারি?' বাচস্পতিমশাইয়ের চোখে বিস্ময়।' কিন্তু ও পদের বেতন তো তোমার বর্তমানে বেতনের প্রায় দ্বিগুণ, একশত টাকা। তুমি বেতনের এতগুলো টাকা ছেড়ে— ও বুঝেছি, দারিদ্রের গঞ্জনা সইতে না পেরে আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে— তাই তুমি নিজেকে বঞ্চিত করে ত্রিশ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে ছুটে এসেছো আমার দারিদ্র্য দূর করতে! ঈশ্বর, আমি ধনী দেখেছি বহু, বিদ্বানও দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো হৃদয় নিয়ে বোধহয় আর কেউ জন্মায়নি।' বিদ্যাসাগরের আত্মত্যাগে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বাচস্পতিমশাই। ঈশ্বরের অনুরোধে যোগও দিয়েছিলেন সংস্কৃত পাঠশালায়।

১৮৫১ সাল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। মায়ের ডাকে বাড়ি এসেছেন। দুপুরবেলা চিলচিৎকার। প্রতিবেশী বামুন পিসি তার ৬ বছরের বিধবা নাতনিকে মারতে মারতে নালিশ জানাতে তাঁর মায়ের কাছে এল। শিশুটি কেঁদে সারা। পিসির অভিযোগ, 'ছি-ছি-ছি। কী অনাছিষ্টির— কী অনাছিষ্টির। বামুনের ঘরের বিধবা। আজ একাদশী, কোথায় নির্জলা উপবাস করবে, তা না রান্নাঘরে ঢুকে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে ফেলেছে। বিদ্যাসাগর শিশুটিকে পিসির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন, রেগে বললেন, 'আপনি কি মানুষ? এইটুকু দুধের শিশু, খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দুটি ভাতই না হয় খেয়ে ফেলেছে। তাকে এভাবে মেরে আধমরা করে ফেলছেন?' পিসি বলেন, 'হ্যাঁরে ঈশ্বর— তুই নাকি শাস্তর পড়ে বড়ো পণ্ডিত হয়েছিস? কিন্তু এ তুই কী শিখ্যে দিচ্ছিস? বামুনের ঘরের বিধবা, একাদশী করবে না?' রাগে-দুঃখে বিদ্যাসাগরের দু'চোখ জ্বলে ভরে উঠল, 'না করবে না। জোর করে একাদশী করানোর মধ্যে কোনো পুণ্যি নেই। আরও শোন, তুমি যদি আর একদিনও ওকে দিয়ে জোর করে একাদশী করিয়েছো বা গায়ে হাত তুলেছো তবে আমি যে তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা মাসোহারা দিই, তা বন্ধ করে দেব।' বিবাদ তো তখনকার মতো থেমে গেল, কিন্তু এই ঘটনা বিদ্যাসাগরের মনে গভীর রেখাপাত করল। ভাবতে লাগলেন— এই বাল্যবিধবা শিশুদের অন্তিম গতি কী?

কলিকাতায় ফিরে দেখা করলেন বেথুন সাহেবের সঙ্গে। তিনি তখন সবে সবে বালিকাদের জন্য স্কুল শুরু করেছেন। তার সঙ্গে এ বিষয়ে গভীর আলোচনা হলো ওঁর। বেথুন সাহেব বললেন, 'এ যে আপনাদের দেশাচার।' বিদ্যাসাগরের সখেদ প্রশ্ন, 'এটা দেশচার? যে দেশে ঋষি মনু বলে গেছেন— 'কন্যাপেব পালনীয়া, শিক্ষনিয়তি যত্নতঃ'— কন্যাকে শিক্ষাদান করে যত্নের সঙ্গে লালন পালন কর্তব্য, যে দেশে পাঁচবছরের একটি শিশুকন্যাকে বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একটা পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনকে হীন ব্যবসায়ে পরিণত করা— এটা দেশাচার? এই বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহ শীঘ্র বন্ধ হওয়া উচিত।'

ক'দিন পরের ঘটনা। বিদ্যাসাগরের কাছে সেদিন হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হওয়া বন্ধু রেভারেন্ড

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন একটা কাজে। ঠিক সেই সময় বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান সেই মদন চট্টোপাধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে এলেন তাঁর কাছে। বললেন, 'দাদা, বড়ো বিপদে পড়েছি। আমাদের গাঁয়ের এক যুবতী, কালীঘাটে তীর্থ দর্শনের জন্য এসে উঠেছে আমার ঘরে। মেয়েটি বাল্যবিধবা। ৫ বছর বয়সে স্বামী মারা যায়। এতোদিন সুনাম নিয়েই ছিল। কিন্তু এখন শুনছি সে অন্তঃস্বত্তা। লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, এখন কী করি?' দুঃখে নুয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর, 'হায় রে, পাঁচবছর বয়সে যে মেয়ে বিধবা হলো তাকে আমরা ব্রহ্মচারিণী করে রাখতে চাই— অথচ যে বিশ্বামিত্রও পারেনি নিজেকে সংযত রাখতে— আমরা তাই আশা করি ওই অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটির কাছে। তুমি যাও মদন, ওকে এখানে নিয়ে এসো, দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি।' রেভারেন্ড তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'ওর কোনো ব্যবস্থাই আপনারা করতে পারেন না। ওকে আপনারা, মানে হিন্দুরা অপমান করতে পারবেন, নির্যাতন করতে পারবেন কিন্তু সম্মান নিয়ে বাঁচার কোনো ব্যবস্থাই আপনারা করতে পারবেন না। বরং আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি। ও যদি খ্রিস্টান হতে রাজি হয় তবে আমাদের সমাজ ওকে খ্রিস্টান সমাজে স্থান দেবে। সেখানে ও আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। চাইলে সুপাত্র দেখে ওর বিবাহ দিয়ে নতুন জীবনও দিতে পারি।' যুবতীটি সব শুনে কৃষ্ণমোহনের কথায় রাজি হয়ে চলে গেল তার সঙ্গে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিদ্যাসাগর শুধু অসহায়ের মতো চেয়ে রইলেন। ভাবতে থাকলেন এই নিঃষ্পাপ বিধবা, যারা হয়তো স্বামীকে চোখেই দেখেনি, সংসারই করেনি তাদের কি আবার নতুন করে বিবাহ দেওয়া যায় না? আমাদের শাস্ত্রে কি তাদের জন্য জীবনভর এই পশুতর জীবন যাপনের বিধানই দেওয়া আছে? হিন্দু সমাজের মেয়েদের এই বিধর্মী হয়ে যাওয়া রোধ করার কোনো উপায়ই কি নেই? এরকম চলতে থাকলে হিন্দু সমাজে আর যে মেয়েই থাকবে না, তারা সব হয় খ্রিস্টান নয় মুসলমান হয়ে যাবে।

মনে প্রশ্নের ঝড়। উত্তরের আশায় শুরু হলো শাস্ত্র অধ্যয়ন। দিন নেই রাত নেই বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা— সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে অকূল সমুদ্রের মাঝে পেলেন তীরের সংকেত রেখা। ঋষি পরাশর রচিত পরাশর সংহিতায় একটি শ্লোক খুঁজে পেলেন।

'নষ্টে মৃতে প্রবজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চতস্বাপস্তু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।' অর্থাৎ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, ক্লীব বা পতিত হইলে নারীদিগের এই আপৎকালে পঞ্চপ্রকার অন্য পতি গ্রহণ করা উচিত। বার বার পড়তে লাগলেন শ্লোকটি। 'না ঠিকই তো আছে। তার অর্থ হিন্দুধর্মে বিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত। এবার এই ব্রহ্মাস্ত্রেই যুদ্ধ শুরু হবে অর্ধশিক্ষিত ভণ্ড ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে।

আর কোনো সংশয় রইল না। নিজে ঘুরে ঘুরে বড়ো বড়ো পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন বিদ্যাসাগর। হাতে প্রমাণ— সেই পরাশর সংহিতা। তাঁর যুক্তির সঙ্গে সকলে সহমত হলেন। তবুও একটা কিন্তু আছে। এই যে প্রাচীন দেশাচার— এর পরিবর্তন করবে কে? বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে প্রত্যয়— 'আমি করবো।'

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের রাজসভায় উপস্থিত হলেন তিনি। সেখানে তখন তাবদ গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত। সকলের সামনে তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে তার যুক্তি রাখলেন। বললেন, 'শুধু পরাশর সংহিতাই নয় 'নারদ সংহিতা'তেও এর উল্লেখ আছে। তাছাড়া সমাজের প্রয়োজনে শাস্ত্রও যুগে যুগে বদলেছে। আজকের যুগে সমাজের প্রয়োজন কী সেটাই বিচার্য।' উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা করলেন ঘোর প্রতিবাদ— 'অর্বাচীন ভণ্ড পণ্ডিত! বিধবা মেয়েদের জন্য তোমার কীসের এত দরদ? আবার কোনো যুবতী বিধবাকে বিবাহ করার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?' রাগে অগ্নিশর্মা বিদ্যাসাগর থর থর করে কেঁপে উঠলেন। বললেন, 'আমি বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তাই এ প্রশ্ন অবান্তর। আমি বাল্যবিবাহেরও বিরুদ্ধে। বাঙ্গলার যেখানে যে বাল্যবিধবারা অশ্রু বিসর্জন করছে তারা সকলে আমার এ কাজের প্রেরণা। আরও শুনুন, ওই যে ন্যায়রত্ন মশাই, যিনি সত্তর বছর বয়সে ত্রয়োদশী ভার্যা নিয়ে ধর্মাচারণ করছেন, আর তার ঘরেই আছে এক এগারো বছরের বিধবা নাতনি, যে মেয়ে দিনরাত দাসীবৃত্তি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর তার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত দিচ্ছে— সে আমার এ কাজের প্রেরণা। আর ওই যে ন্যায়ালংকার মশাই, যিনি তার ষোড়শী পুত্রবধূটিকে দিয়ে নির্জলা একাদশীর দিনেও পঞ্চব্যাঞ্জন আমিষ রাঁধিয়ে পৈশাচিক তৃপ্তি নিয়ে আহার করেন— যে পুত্রবধূর মনের গোপন কান্না বুঝতেও পারেন না— সেও আমার এ কাজের প্রেরণা। তাদের মুক্তির জন্যই আমার এ লড়াই।' শুনে রে রে করে তেড়ে এল পণ্ডিতের দল। বিদ্যাসাগর করজোড়ে বললেন, 'ওঁরা যে সকলে আমার মা। সন্তানের দরদ দিয়ে মাতৃ জাতির দুঃখ আমি ঘোচাতে চাই। শাস্ত্রে এর নির্দেশও আছে। তাই আমি যখন মনে করেছি বিধবা বিবাহের প্রয়োজন আছে— তখন বিধবা বিবাহ হবেই, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না।'

মা-বাবার সম্মতিও জুটে গেল। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হলো পথ চলা। রাজনারায়ণ বসু, কালীসপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ হলেন যোগ্য সহযোগী। মিস্টার মার্শালের মাধ্যমে সরকারের কাছে 'বিধবা বিবাহ' আইনে পরিণত করার আহ্বান জানালেন। বিরোধী পণ্ডিত সমাজও বসে ছিল না, তারা সর্বসাধারণের ১০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পাঠাল। বিদ্যাসাগরও সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য, পণ্ডিতদের স্বাক্ষর পাঠালেন সরকারের কাছে। অবশেষে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হয়ে গেল। রামমোহন সতীদাহ প্রথা রোধের মাধ্যমে বিধবাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, আর বিদ্যাসাগর সেই বিধবাদের বিবাহ করার অধিকার দিয়ে তাদের স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে পুনরায় বাঁচার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরই অনুগত শ্রীশ বিদ্যারত্নের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কালীমতীর বিবাহ দিয়ে শুরু হলো এর জয়যাত্রা। ১৮৭০ সালে নিজের পুত্র নারায়ণের সঙ্গে বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ দিয়ে 'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম' এই ইংরেজি আপ্তবাক্যের সফল প্রয়োগ করে গেলেন তিনি।

বিদ্যাসাগর বলতেন, 'জীবন পরহিতে'। তাঁর সারা জীবনের পরহিতের কাহিনি লিখতে বসলে বোধকরি একটি বড়ো পুস্তিকাও অকুলান হবে। তাই সে কাহিনি না হয় অন্য একদিন হবে। ১৮৯১ সালে এই বরেণ্য বাঙ্গালি মনীষী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি অমর। যতদিন বাঙ্গালি বেঁচে থাকবে ততদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগরও বেঁচে থাকবেন। তিনি বেঁচে থাকবেন শিশুর 'বর্ণপরিচয়' 'ঋজুপাঠে'; বেঁচে থাকবেন শিক্ষাব্রতীদের 'ব্যাকরণ কৌমুদী' আর 'সংস্কৃত উপক্রমণিকায়'; বেঁচে থাকবেন শিক্ষার গল্প 'কথামালা' 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে; বেঁচে থাকবেন ভারত আত্মার জ্ঞান আহরণ ব্রতীদের 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তি বিলাসে'; আর বেঁচে থাকবেন নারীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে— যাদের জন্য বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। ■

ছোটোখাটো মানুষটির হাত ধরে জাগরণের জোয়ার এসেছিল

নিখিল চিত্রকর

১৮৫৫ সালের শেষ দিকে ব্রিটিশ শাসিত তদানীন্তন ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বহুবিবাহ-রদ সংক্রান্ত এই আবেদনপত্রে সই করেছিলেন স্বয়ং বর্ধমানের রাজা মহতাব চাঁদ এবং দিনাজপুর, নদীয়া, নাটোরের রাজা-সহ বঙ্গদেশের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, বহুবিবাহ বন্ধের সপক্ষে পঁচিশ হাজার ব্যক্তির সমর্থন ছিল বিদ্যাসাগরের পক্ষে। প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের খ্যাতি তখন মধ্য গগনে। বঙ্গসমাজকে পিছিয়ে দেওয়া একের পর এক অনাচার নিয়ে তাঁর সওয়ালে জেরবার তখনকার সমাজের রক্ষণশীল হর্তাকর্তারা। এবার কুলীন সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের অন্ধকার দিক নিয়ে সোচ্চার হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

শিক্ষিত প্রগতিশীল বিদ্বজ্জনদের দ্বারস্থ হয়ে জনমত গড়ে তুললেন তিনি। বহুবিবাহে বঙ্গনারীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন নিজের লেখায়। একের পর এক আবেদন পত্র পাঠানো হলো সরকারের ঘরে। একই মর্মে বহু আবেদনপত্র স্তূপীকৃত হলে নড়েচড়ে বসলেন বড়োলাট।

১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যাসাগর পেলেন প্রতিশ্রুতি। গভর্নমেন্টের তরফে বলা হলো বহুবিবাহ রদে তৈরি হবে খসড়া বিল। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় সরকারের পক্ষে খসড়া বিল তৈরির দায়িত্ব পেলেন। পরবর্তীতে খসড়া বিল তৈরিও হলো, কিন্তু মহা বিদ্রোহের ঝড়ে সব কিছু ওলটপালট হয়ে, হারিয়ে গেল বিলের কপি। তবু থামানো যায়নি ঈশ্বরকে।

নানা সময়ে লেখালেখির মাধ্যমে বহুবিবাহের বিরোধিতা চালিয়ে গেছেন তিনি। ১৮৭১ সালে লিখলেন 'বহুবিবাহ নিবারণ হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে

একটি বই। লেখাটি নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল রক্ষণশীল পণ্ডিতদের মধ্যে। অধিকাংশ পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধ মত পোষণ করে লিখলেন, 'বিদ্যাসাগর নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও কৌলিন্য প্রথার মহাত্ম্যে কালিমালিপ্ত করছেন', 'কুলীন হওয়া যার-তার সয় না' ইত্যাদি। তবে সেসব তির্যক মন্তব্য গায়ে মাখেননি বিদ্যাসাগর। বরং আরও একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন ১৮৭৩ সালে। বহুবিবাহ নিয়ে কুলীন পণ্ডিতদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে অনেক বাদানুবাদে জড়িয়েছিলেন। রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মতো রক্ষণশীল পণ্ডিতরা বিদ্যাসাগরের সংস্কারপন্থী আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিরোধী পক্ষে আরেকটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন কালনার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি। বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর ও তারানাথ যেভাবে একে অপরকে বাক্যবাণ ছুঁড়তে শুরু করেন তা একসময় উচ্চ পর্যায়ের নির্মল রসিকতায় পৌঁছে যায়। 'বহুবিবাহ নিবারণ হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক বইটিতে নাম না নিয়ে তারানাথ বাচস্পতিকে 'খুড়ো' সম্বোধন করলেন। 'ভাইপো' সম্বন্ধ পাতিয়ে বিদ্যাসাগর তারানাথবাবুর উদ্দেশে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় যেভাবে যুক্তিখণ্ডন করলেন তেমন উচ্চমানের রসিকতা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

আপাতভাবে মজার হলেও, যে বিষয় নিয়ে বইটি লেখা তা কিন্তু বেশ গুরুগম্ভীর। বহু বিবাহ নিয়ে সেই সময় বিদ্যাসাগর হলুস্থুল বাঁধিয়েছেন বাঙ্গলার সমাজে। বহুবিবাহকে আক্রমণ করে একের পর এক বই লিখে গেছেন তিনি। আর তাতে তীব্র শ্লেষে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তখনকার রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ। এমন সময় বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় ময়দানে নামলেন তারানাথ বাচস্পতি। বহু বিবাহের সমর্থনে তিনি লিখে ফেললেন বই। আর সংস্কৃতে লেখা সেই বই ছিল ভুলে ভরা। বেঁধে গেল তর্কযুদ্ধ। এমন সুযোগ হাতছাড়া করলেন না বিদ্যাসাগর। বাচস্পতি মশাইয়ের সংস্কৃতজ্ঞানকে কৌতুক করে লিখলেন 'অতি অল্প হইল'। শুরুটা হলো 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত' বলে কাকা-ভাইপো সম্বন্ধ পাতিয়ে। বইটিতে কোথাও তারানাথের নাম উল্লেখ করলেন না। শুধু 'খুড়ো' সম্বোধনে যেভাবে বিদ্যাসাগর একের পর এক কৌতুক, উপমা ব্যবহার করে ব্যঙ্গের জাল বুনেছেন, তা বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ঘরানার ব্যতিক্রম।

ওদিকে বিদ্যাসাগরের 'খুড়ো' সম্বোধনের এই ব্যঙ্গে চটে লাল হলেন তারানাথ। তিনি আপত্তি তুললেন 'ভাইপোস্য' শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে। লিখলেন, ওই শব্দ সংস্কৃতে নেই সুতরাং বিদ্যাসাগরেরও সংস্কৃতজ্ঞান পোক্ত নয়। বিদ্যাসাগর কিন্তু ইচ্ছে করেই 'ভাইপোস্য' শব্দটির ফাঁদ পেতেছিলেন তাঁকে উত্তেজিত করতেই। আর সেই ফাঁদে পা দিলেন তারানাথ। কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগর লিখলেন 'আবার অতি অল্প হইল।'

এবারও তিনি বাচস্পতি মশাইকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন, 'খুড়ো এত বড়ো পণ্ডিত ও এত বড়ো বুদ্ধিশীল হইয়া, কোন বিবেচনায়, 'ভাইপোস্য'— এই বিশুদ্ধ প্রয়োগটিকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন।' এই বলে 'ভাইপোস্য' শব্দের গঠনমূলক ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করলেন বিদ্যাসাগর। ব্যাকরণ বহির্ভূত শব্দের বৈধতা আরোপ করার এমন বিকট যুক্তির ভিতরে 'খুড়ো'-কে তিনি যেভাবে ঠাট্টা করেছেন তা জেনে অবাক হতে হয়। বলা বাহুল্য, এমন জবাব পেয়ে 'ভাইপো' বিদ্যাসাগরকে আর ঘাঁটাতে যাননি তারানাথ, অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন তারানাথ।

এই তারানাথ বাচস্পতিকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। তার জন্য পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে কালনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে, ওই পদে নিয়োগের জন্য বিদ্যাসাগরের নাম সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতে, 'তারানাথ আমার চেয়ে অনেক বড়ো পণ্ডিত, নিয়োগপত্র পাওয়ার যোগ্যতা তাঁরই আছে।' সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায় তারানাথ বাচস্পতি ছিলেন বিদ্যাসাগরের সিনিয়র। সেই সুবাদে বাচস্পতি মশাইয়ের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বহুবিবাহ আন্দোলনের আখড়ায় বাগবিতণ্ডা থাকলেও সেই সম্পর্ক ম্লান হয়ে যায়নি।

বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলনের দরুন ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতে পারেন, বিধবাদের দুর্দশার অন্যতম দুটি কারণ--- বহুবিবাহ ও বাল্যবৈধব্য। তাই বহুবিবাহ রোধ করা ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। পথ যে সুগম হবে না, সেকথা জানতেন তিনি। তাই কুলীন সমাজের শাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে নিজের পাণ্ডিত্যকে আরও ক্ষুরধার করেছিলেন। যেমন, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের আদৌ কোনো বিধান আছে কিনা, সেই প্রশ্নের জবাবে 'পরাশর সংহিতা'র শ্লোক উল্লেখ করে চোখ খুলে দিয়েছিলেন তাবড় পণ্ডিতদের। আবার বহুবিবাহ রদে দ্বারস্থ হয়েছিলেন মনুসংহিতা'র। তবু সমাজের বিধানদাতারা গোঁড়ামিতে ছিলেন অবিচল। কিন্তু গোঁড়ামি ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের ধাতে ছিল না। বিধবাবিবাহ প্রচলনের মাধ্যমেও সামাজিক গোঁড়ামির শৃঙ্খল ভেঙেছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহের জন্য শরীরপাত ও অর্থ বিনিয়োগের আগে থেকে তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, কৌলিন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে কুলীনরা বহু সংখ্যক বিবাহ করেন। তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিবাহিত স্ত্রীদের জীবন বৈধব্যে পর্যবসিত হয়। এই অনিবার্য বৈধব্য বিধবাবিবাহ প্রথাকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাছাড়া মেয়েদের অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার জন্য বয়স্ক স্বামীর মৃত্যুতে বাল্যবিধবাদের সংখ্যাও দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই বাস্তব উপলব্ধিই ঈশ্বরচন্দ্র ব্যিদাসাগরকে বহুবিবাহ প্রথা রোধে আইনি পথে হাঁটতে বাধ্য করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙ্গলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং বঙ্গসমাজে প্রগতিশীল সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। একদিকে তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকার। অন্যদিকে বাল্যবিবাহ রোধ ও তখনকার তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করছেন। এই ছোটোখাটো মানুষটির হাত ধরেই জাগরণের জোয়ার এসেছিল ভারতবর্ষের শিক্ষা-সাহিত্য সামাজিক পটভূমিতে। ▯

নিজের উদ্যোগে ষাট জন বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন

ড. অঞ্জনা পায়ড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অপরাজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার নবজাগরণে যাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি আন্দোলন। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নারী সমাজকে ন্যায্য অধিকার দিতে গিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে দেশ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন দেশের মানুষের অর্ধেক সংখ্যাকে পিছিয়ে রেখে দেশ এগোতে পারে না।

কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এই কুপ্রথাটির ফলে নারীরা কতটা অসহায়। কেবল অর্থলোলুপতার কারণে কুলীন ব্রাহ্মণরা এই হীন বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। হুগলী জেলার ১৩৩ জন ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্পর্কের তালিকা তৈরি করে তিনি দেখান যে সমাজে কৌলিন্যপ্রথার সুযোগ নিয়ে কীভাবে নারীজাতির সর্বনাশ করা চলছে।

বহু বিবাহ নিয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করেন। বহুবিবাহ স্ত্রীজাতির অশেষ যন্ত্রণার কারণ ছিল। সমাজের শিক্ষিত মানুষদের সচেতনতার পাঠ দিতে তিনি একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। পত্রে দশটি অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ ছিল—

(১) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হলে কন্যার বিবাহ দেব না। (২) কন্যাকে শিক্ষাদান করাবো। (৩) কুলীন, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গণনা না করে স্বজাতির সৎপাত্রে কন্যাদান করব। (৪) কন্যা বিধবা হলে, তার অনুমতি নিয়ে পুনরায় বিবাহ দেব। (৫) আঠারো বছর পূর্ণ না হলে পুত্রের বিবাহ দেব না। (৬) এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে আর বিবাহ করব না। (৭) যার এক স্ত্রী বিদ্যমান তাকে কন্যাদান করব না। অঙ্গীকারে ব্যাঘাত ঘটে এমন আচরণ করব না। (৯) মাসে মাসে নিজের আয়ের হিসাব ধনাধ্যক্ষের কাছে পাঠাবো। (১০) অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে তা পালনে পরাঙ্মুখ হবো না।

এই ঘটনায় সমাজে নিন্দার ঝড় উঠেছিল কিন্তু তিনি অসম্ভব জেদ নিয়ে এই লড়াইয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৫০ সালে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে ৫০ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন তিনি সরকারের কাছে পাঠান। ১৮৭১ সালে দুটি পুস্তক প্রকাশ করে প্রচার করেন যে, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারণে সরকার এক্ষেত্রে কোনও আইন প্রণয়ন করেনি ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রচার প্রচেষ্টায় বহুবিবাহ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

বাল্যবিবাহ নিয়েও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন তা আজকের দিনেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয় তাহা দম্পতিরা কখনো আস্বাদ করিতে পারে না, ... পিতা-মাতারা... কন্যাদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্যবোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবী সুখ-দুঃখের প্রতি একবার নেত্রপাত করেন না।' তাঁর এরকম জোরালো প্রচারে ব্রিটিশ সরকার আইন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১০ বছর করে দেয়।

বিধবাবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, মানবতাবাদের উত্তরণে এক তাৎপর্যময় ঘটনা। তিনি বলেছেন, 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।' সতীদাহ প্রথা রদ হলে বিধবার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। এই বিধবাদের অধিকাংশই ছিল শিশু। সমাজে এই বিধবাদের প্রতি যে অপরিসীম লাঞ্ছনা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার জুটত, বিদ্যাসাগরের প্রাণে তা যন্ত্রণাদায়ক মনে হতো। তিনি বলেছেন, 'তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণবৎ হইয়া যায়, ... যে দেশে পুরুষদের দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়বিচার নাই... হে অবলাগণ তোমরা কী পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।' তিনি মেয়েদের এই অপমান দূরীকরণে ব্রতী হলে সমাজপতিরা তাঁকে বিদ্রূপে ও অপমানে জর্জরিত করে। বিধবাবিবাহ উচিত কী না বিষয়ে ১৮৫০ সালে তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হতে নানা তথ্য সংগ্রহ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ সাল গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির কাছে এক হাজার জন শিক্ষিত বাঙ্গালির স্বাক্ষর-সহ একটি পিটিশন জমা দেন। তাঁর পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়।

তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতীকে বিবাহ করেন। নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে অষ্টাদশী বিধবা ভবসুন্দরীর বিয়ে দেন। নিজের উদ্যোগে ৮২ হাজার টাকা খরচ করে ৬০ জন বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। ■

কল্যাণ ভবনে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের বার্ষিক সম্মেলন

গত ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার মানিকতলা-স্থিত কল্যাণ ভবনে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সক্ষমের দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। প্রাধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ সুকুমারজী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দিব্যাঙ্গ কণ্ঠশিল্পী স্বপন মালিক। তারপরেই সক্ষমের কার্যকলাপ নিয়ে একটি ভিডিয়ো প্রদর্শিত হয়। প্রধান বক্তা ডাঃ সুকুমারজী বিস্তারিত ভাবে সক্ষমের কার্যকলাপ বর্ণনা করে সবাইকে সংগঠনে যুক্ত হতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ইএসআই মেডিক্যাল কলেজের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডাঃ উচ্ছ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ কুণ্ডু, ডাঃ সমতীর্থ চন্দ্র, ডাঃ সতীশপ্রকাশ বাঙ্কা, সমাজসেবী শ্রীমতী গীতাঞ্জলি মুখার্জি প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আগামীদিনে 'নেত্রগঙ্গা কার্যক্রম' করা, কর্নিয়ামুক্ত ভারত অভিযান চালিয়ে যাওয়া এবং অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করার কথা বলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী ঈশিতা চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনীক বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন ডাঃ তরুণ সরকার।

নরেশ ভবনে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক

গত ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতার মানিকতলা-স্থিত নরেশ ভবনে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য কার্যকারিণীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৭টি জেলা থেকে ৪৬ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। রীতি অনুসারে সরস্বতী বন্দনা দিয়ে বৈঠক শুরু হয়। উপস্থিত জেলা কার্যকর্তারা জেলার বৃত্ত নিবেদন করেন। বৃত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা তাদের সদস্যকরণ অভিযান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করান। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জেলার কার্যকর্তারা যে কার্যক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা তাঁদের বক্তব্যে প্রকাশ পায়। বৈঠকের দ্বিতীয় ভাগে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক আগামীতে কীভাবে ও কী ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে সংগঠন চলবে তার রূপরেখা বর্ণনা করেন। জেলা কার্যকর্তাদের কার্যপদ্ধতি ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করে কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। এরপর রাজ্য সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বৈঠকের শেষভাগে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অরিজিৎ বক্সি উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আইনি পরামর্শ প্রদান করেন। সমাপ্তি বক্তব্যে রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কার্যকর্তারা যেভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রদূত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

রাজদীপ মিশ্র

জাপানে প্রতিদিন শোবার জন্য দক্ষিণ দিকে মাথা দিকে ঘুমোতে দেখে এক বন্ধু বলে, বেহারী, (এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন) তুমি দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে ঘুমাও— সেটা ঠিক নয়। ভারাক্রান্ত স্বরে সেই ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'তুমি রুষ্ট হয়ো না। আমি সারা দিনের শেষে ওইদিকে ভারতমায়ের কোলে মাথা রেখে নিজেকে প্রাণবন্ত করি'। এমনই দেশপ্রেমিক ছিলেন বাসবিহারী বসু। তিনি বলতেন, 'বিপ্লবীদের মন এতটাই নিয়ন্ত্রিত হবে যে ডান হাত কী করছে বাঁ-হাত জানবে না।'

রাসবিহরী বসু ছিলেন বিনোদবিহারী বসু ও ভুবনেশ্বরী দেবীর সন্তান। পূর্ব বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলা শিক্ষাও। শিক্ষকদের কাছ থেকে শোনা বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গল্প ছিল তার পরবর্তীকালের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। স্কুলের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বদলে দেশপ্রেমের কথা বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের কথা আছে এমন সব বই পড়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর মনকে নাড়া দিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক লেখাগুলিও তাকে উদ্বুদ্ধ করত। রাসবিহারী বসু-সহ চন্দননগরের বহু তরুণ বিপ্লবী নিরালম্ব স্বামীর দ্বারা প্রচারিত সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। নিরালম্ব স্বামী (যার সংসার জীবনের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ওই একই সময়ে রাসবিহারী চন্দননগরের দুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরের বিপ্লবী চিন্তাধারার পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি তাঁর বাসভবনে 'সুহৃদ সম্মিলিনী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, শারীরিক ব্যায়াম চর্চা, ইতিহাস ও বিপ্লব মূলক বইপত্র পাঠ, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি ছাত্র-যুব দের দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করতেন। তার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন কানাইলাল দত্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের মতো বিপ্লবীরা। অধ্যাপক রায়ের বাড়িতে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সখারাম দেউস্কর প্রমুখ বিপ্লবীদের যাতায়াত ছিল। রাসবিহারী বসু 'সুহৃদ সম্মেলনী'তে যোগ দিয়ে জীবনের এক নতুন দিশা পান।

কলেজ স্তরের পড়াশোনার নিয়মমাফিক সমাপ্তি ঘটার আগেই রাসবিহারী বসুর জীবনধারা অন্যদিকে বাঁক নেয়। কলেজে পড়াশোনার বদলে অন্যদিকে মনোযোগ, তার অস্থিরচিত্ততা লক্ষ্য করে চন্দননগরের তাঁর বাবার এক আত্মীয় ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁকে কেরানি হিসেবে ঢুকিয়ে দেন। এরপর রাসবিহারীর বাবার অনুরোধে তাঁকে সিমলার সরকারি ছাপাখানায়

রাসবিহারী ছিলেন একনিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে ভরপুর। নিয়ম ও সময় জ্ঞান ছিল তার অত্যন্ত প্রখর। তাঁর প্রবল আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ তাকে আজীবন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছিল। জাপান সরকার তাঁকে সেখানকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' উপাধিতে ভূষিত করে।

বদলি করা হয়। পরবর্তীকালে বিখ্যাত দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগ দেন।

দেরাদুনে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় যুগান্তরের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁরই হাত ধরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বাধীন এক বিপ্লবী গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। যোগাযোগ হলো আর্য সমাজের বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে, যাঁদের কাজের জায়গা ছিল উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব। কর্মসূত্রে দেরাদুনে থাকলেও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জাল তিনি বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে বিস্তার করেছিলেন। রাসায়নিক ব্যবহার ও তার প্রয়োগের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ ছিল যে তিনি 'ক্রুড' বোমা তৈরি শিখেছিলেন।

১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হচ্ছে কলকাতা থেকে দিল্লিতে। ভাইসরয় হার্ডিঞ্জকে স্বাগত জানাতে দিল্লি তৈরি। রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনা ও নির্দেশে চাঁদনীচকের এক বাড়িতে রোগা চেহারার মহিলার ছদ্মবেশে ১৬ বছরের বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ভাইসরয় জখম হন। বিস্ফোরণের পরদিনই দেরাদুনে ফিরে এসে রাসবিহারী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকেন। গদর আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। দেরাদুনে থাকলেও ছদ্মবেশে বিভিন্ন কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। যখন তাঁর মাথার দাম ওঠে এক লক্ষ টাকা, সে সময় পুলিশের চিফ কমিশনারের ঠিক উলটো দিকে বসে ছদ্মবেশে তিনি ট্রেনে সফর করেছিলেন। ছদ্মবেশেই ১৯১৩ সালের বন্যা বিধ্বস্ত সুবলদহে ত্রাণ বিলির জন্য আসেন। বৈপ্লবিক কাজের জন্য এত বেশি ছদ্মবেশ সম্ভবত আর কোনো বিপ্লবীকে ধারণ করতে হয়নি। ভারতের সেনাবাহিনীতে বিপ্লবীদের প্রবেশ করিয়ে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতব্যাপী একটি বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা ব্যর্থ হয়। হার্ডিঞ্জের উপর হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এবং আরও অন্যান্য অভিযোগ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। ১৯১৫ সালের ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে জাপানি জাহাজ 'সানুকি-মারু'তে করে নিজেই পাসপোর্ট অফিস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় রাজা প্রিয়নাথ ঠাকুর ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

তাঁর অসাধারণ কূটনৈতিক বুদ্ধি ও বিচলক্ষণতা জাপানি নেতৃবৃন্দের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাপানি ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশ্বাস ও রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ছিল ভিন্ন দুই দেশ, দুটি জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় রক্ষার্থে অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ, যাতে তিনি সফল হয়েছিলেন। জাপানে তিনি খুঁজে পেলেন বিভিন্ন এশীয় গ্রুপের ছত্রছায়া। ব্রিটিশরা রাসবিহারীকে প্রত্যার্পণের জন্য জাপান সরকারকে চাপ দিতে থাকে। ১৯২৩ সালে তিনি জাপানের নাগরিক হন। সেখানে তিনি সাংবাদিক তথা লেখক হিসেবে বসবাস কারতে থাকেন। ওই বছরই ২৭ নভেম্বর টোকিওতে লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে তিনি সভা করলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে খবর যায়। এরপর ব্রিটিশ সরকারের চাপে জাপান মারফত জারি হলো নির্বাসনের আদেশ। তাঁরই তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পাশে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানায়।

১৯৪২ সালের ২৮-২৯ মার্চ টোকিয়োতে তাঁর ডাকে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সেই সম্মেলনে একটি সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ নামক বৈপ্লবিক সংগঠনটি পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতকে মুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠে।

১৯৪২ সালের ২১ জুন ব্যাংককে তিনি লিগের দ্বিতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসুকে লিগে যোগদান ও এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্ব ও পরিস্থিতি বুঝে ১৯৪০ সালে 'আজকের অবিসংবাদিত নেতা' হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ঘোষণা করেছিলেন রাসবিহারী বসু।

১৯৪২ সাল রাসবিহারী বসু পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৈরি করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)। এই সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল জাপানের সহায়তায় ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজের উচ্ছেদ। এই বাহিনী মূলত গঠিত হয় জাপানের হাতে ধরা পড়া ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে। এরা মালয় অভিযান ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধের সময় জাপানের হাতে ধরা পড়েছিল। এছাড়াও মালয় ও ব্রহ্মদেশের ভারতীয় প্রবাসীদের একটি বিরাট অংশ এই বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক রূপে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি এই আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে অর্পণ করেন।

জাপান সরকার তাঁকে সেখানকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' উপাধিতে ভূষিত করে। রাসবিহারী ছিলেন একনিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে ভরপুর। নিয়ম ও সময় জ্ঞান ছিল তার অত্যন্ত প্রখর। তাঁর প্রবল আধ্যাত্মিক চেতনা বোধ তাকে আজীবন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছিল। প্রিয়তম কবি বরার্ট ব্রাউনিঙের 'Prospice' কবিতার দুটি লাইন তাঁর খুব প্রিয় ছিল—

'I was ever a fighter,
So-- one fight more
The best and the last!'

এই পঙ্‌ক্তিগুলি মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। ◻

রামায়ণ সংস্কৃত থেকে নেপালি ভাষাতে অনুবাদ করেন কবিরত্ন ভানুভক্ত

কৌশিক রায়

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সহনশীলতা, মনন ও বৈচিত্র্যের অন্যতম মহাকাব্যিক প্রতীক দাশরথি রাম এবং জনকনন্দিনী সীতাদেবীর কৃপাধন্য রামায়ণ বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাদৃত হয়েছে। থাইল্যান্ডের (শ্যামদেশ) মানুষরা, তাঁদের দুই রাজা চোলোলোং খোরোন এবং উ-থননের মধ্যে রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের প্রতিরূপকে খুঁজে পান। থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথিয়াকে সরযু নদী বিধৌত অযোধ্যা রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জাভা ও বালিদ্বীপের সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে জড়িয়ে আছেন রাম-সীতা। ইন্দোনেশিয়া-সুমাত্রা-জাভাতেও রামায়ণের গুরুত্ব অনেক বেশি। মহাকাব্য রামায়ণ অবশ্য মহর্ষি বাল্মীকির দ্বারা সংস্কৃত ভাষাতে রচিত বলে জনসাধারণের কাছে এই অমূল্য সাহিত্য রত্নাকরটি কিছুটা দুর্বোধ্য ছিল। রামায়ণকে জনমানসে স্থান দেওয়ার জন্য তুলসীদাস লিখেছেন হিন্দি 'রামচরিতমানস', তামিল রামায়ণ লিখেছেন কবি কম্বন। তবে সহজবোধ্য নেপালি ভাষাতে রামায়ণের জটিল শ্লোকগুলির অনুবাদ করে খেটে খাওয়া পার্বত্য জনমানসে রামায়ণের আদর্শবাদকে প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হয়েছিলেন নেপালি ভাষার আদিকবি ভানুভক্ত আচার্য।

১৮১৪ সালের ১৩ জুলাই নেপালের তানাহুন জেলার অন্তর্গত চুণ্ডী রামগাহা গ্রামে ভানুভক্ত জন্মগ্রহণ করেন। ভানুভক্তের বাবা ধনঞ্জয় আচার্য ছিলেন সরকারি আধিকারিক। মা ধর্মাবতী ও পিতামহের আগ্রহে স্বগৃহে এবং পরে বরাণসীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন ভানুভক্ত। সেই সময় নেপালি ও দক্ষিণ এশিয়ার সিন্হালা, কারেন, শান-এর মতো ভাষাগুলির কোনও লিখিত রূপ বা সাহিত্যগুণ ছিল না।

সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য থাকার জন্য মাঘ, কালিদাস, শূদ্রক, দণ্ডী, বিশাখ দত্ত, গুণাঢ্যদের লিখিত সাহিত্য পাঠ করে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণরা নিজেদের নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্যের জন্য ব্রাহ্মণরা নিজেদের মূল ইউরোপীয় ভাষা লাতিন- জানা পণ্ডিতদের মতোই মনে করতেন। আত্মগর্বী ব্রাহ্মণদের এই বৌদ্ধিক একাধিপত্যকে খর্ব করার জন্য ভানুভক্ত আচার্য তদানীন্তন নেপালের 'রাণা' বংশের নৃপতিদের সাহায্যে নেপালি ভাষাকে জনপ্রিয় করার কাজে আত্মবিনিয়োগ করেন। নেপালী ভাষার অন্যতম কবি এবং ভানুভক্ত আচার্যের জীবনীকার— মোতিরাম ভট্টর বর্ণনা থেকে জানা যায়— ভানুভক্ত রামায়ণের 'ভাব' ও 'মর্ম'কে অবিকৃত রেখে মহাকাব্যটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন। বাল্মীকি-কৃত আদি রামায়ণের 'ছান্দসিকতা ভানুভক্ত আচার্য তাঁর নেপালি অনুবাদে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। স্বশিক্ষিত ও বিদেশি ভাষা শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হওয়া ভানুভক্ত নিজের চেষ্টাতেই রামায়ণের ধর্মীয় পবিত্রতাকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

স্বচ্ছল পরিবারে জন্মানোর জন্য ভানুভক্ত আচার্য আর্থিক অনটনের শিকার হননি। তবে মানবজীবনে অভাব অনটনের তীব্রতা যে কী, তা ভানুভক্ত বুঝতে পারেন এক ঘেসেড়ার সঙ্গে কথা বলে। সেজন্যই তাঁর অনূদিত রামায়ণে সারথি ছন্দক এবং গুহক চণ্ডালের চরিত্র আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে, মানবজীবনের এক নবনির্মিত মহাকাব্য হিসেবে 'ভানুভক্তে রামায়ণ', অবশ্যই নিজের স্থান তৈরি করে নিয়েছে। পঞ্চদশ শতকে নেপালে 'খাস' রাজবংশের পতনের পর নেপালি সংস্কৃতিতে যে ভাঁটা পড়েছিল, সেখানে জোয়ার নিয়ে এসেছিল ভানুভক্ত আচার্যের অনূদিত রামায়ণ। তাঁর ঐন্দ্রজালিক লেখনীর মোহস্পর্শে যেন শ্রীরামের সেতুবন্ধন, অশোককাননে বন্দিনী জানকীর বিলাপ, পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনগমন— এই ঘটনাগুলি এক সংগীতময় রূপ পেয়েছে।

রাজনৈতিক দোলাচলের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন ভানুভক্ত আচার্য। কারাগারে থেকে দেশের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠিগুলির তিনি লিখেছিলেন, সেগুলির সঙ্গে কারারুদ্ধ ইতালির সাম্যবাদী আন্তোনিও গ্রামোসি, সোভিয়েত ঔপন্যাসিক ফিওদোর দোস্তেয়েভস্কি এবং জার্মান নারীবাদী রোজা লাক্সেমবার্গের চিঠির তুলনা করা যায়। এই চিঠিগুলির ওজস্বিনী বক্তব্যের জন্যই ভানুভক্ত আচার্য তাঁর হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। দার্জিলিঙের চৌরাস্তার মাথায় উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ভানুভক্ত আচার্যের স্ট্যাচুটি যেন সর্বসাধারণের মনের দরজার কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের আমূল্য মণিরত্নকে নিয়ে আসার এক চিরায়ত বার্তাবহ হয়ে বিরাজ করছে। ▯

ভারতীয় কৃষকের আরাধ্য দেবতা বলরাম

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভাদ্র শুক্লাষষ্ঠীতে ভারতীয় কৃষকসমাজে কৃষি ও গো-পালনের দেবতা ভগবান বলরাম জয়ন্তী পালিত হয়। থমাস হার্ডির লেখা 'ইন দ্য টাইম অব দ্য ব্রেকিং অব নেশনস' কবিতাটি যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি, আমার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কবিতাটি পড়াতে গিয়ে ভগবান বলরামের কথা বলেছিলেন। কবিতায় আছে, 'Only thin Smoke without flame/From the heaps of couch-grass;/Yet this will go onward the same/Though dynasties pass.' অর্থাৎ যুদ্ধ হবে, জাতির পতনোত্থান ঘটবে, সাম্রাজ্যের বদল হবে, তবুও কৃষিক্ষেত্র একইভাবে ফলদায়ী হবে, কৃষক আপন জমিতে লাঙ্গল দিয়ে মাটির চেলা ভাঙবে, জমিতে আগাছা-ঘাসের আগুন ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠবে। সভ্যতা আপনার প্রয়োজনের গতিতে এগিয়ে চলবে, থেমে যাবে না।

জানা যায়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হলধর ভগবান বলরাম কোনো পক্ষই অবলম্বন করেননি। তিনি তীর্থে তীর্থে যাবার পথে কৃষক সমাজকে কৃষিকাজে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। কারণ বহু কৃষক বহু রাজার সৈন্যরূপে যুদ্ধে গেছেন, কৃষিকাজ না হলে বিপুল মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হয়ে যাবে। আপন আচরণে এই বার্তাটি দেবার মাধ্যমে ভগবান বলরাম বুঝিয়েছেন, দল-নিরপেক্ষভাবে, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষভাবে সকল কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষির মাধ্যমে দেশহিতৈষণায় নিয়োজিত থাকতে হবে। কিন্তু কৃষিকাজ থেকে কৃষক যেন আপন সৌকর্যে আপন প্রাপ্তি লাভ করেন, তার জন্যও ভগবান অনন্ত আশীর্বাদ রেখে গেছেন। ভগবান বলরাম আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন, কীভাবে সকল বাধাবিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে আত্মবল, আত্মবিশ্বাস ও সংগঠিত শক্তিকে সঙ্গী করে দুষ্টের দমন করা যায়, আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করা যায়। শ্রীবলরাম কৃষক চৈতন্যকে জাগ্রত করার এক মহাশক্তি— কৃষির বিকাশ ও উন্নয়নের দেবতা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভগবান বলরামকে দুধ ও পুত্রের দাতারূপেও পূজা করা হয়। তাঁর জন্মদিনে সমগ্র ভারতের নানান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় উৎসব। মহিলারা ব্রত উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠিত হয় মেলা ও কৃষি-কৃষ্টির নানান উৎসব। এই দিনটিকে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ তাদের প্রেরণাদায়ী দেবতার আবির্ভাব তিথিরূপে বিশেষ মর্যাদায় পালন করে। ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বলরাম জয়ন্তী। তিনি কেবল পরম্পরাগত চাষের দেবতা নন, তিনি চাষের প্রকার, সেচন প্রক্রিয়া ও বিকাশের আশীর্বাদক। উন্নত কলাকৌশলে চাষাবাদ, তারই সুবাদে ধন-ধান্যে সম্পদশালী জীবনের তিনি ভারতীয় প্রেরণা। তাঁর অস্ত্র 'হল'। তাই তাঁর নাম 'হলধর' বা 'হলায়ুধ'। অর্থাৎ লাঙ্গলধারী ঈশ্বর তিনি, কৃষিকৃষ্টির দেবতা। লাঙ্গল হচ্ছে কৃষি ও গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে এক নির্মাণের প্রতীক। কিন্তু নির্মাণের জন্য অশুভ শক্তিকে, অধর্মকে পরাস্ত করতে হয়, দুষ্টকে দমন করতে হয়, তার জন্যও আয়ুধ দরকার। সেই আয়ুধ হলো মুষল, যা ধার্মিক ও শিষ্টলোককে পালন ও রক্ষণে সহায়তা করে।

কে এই বলরাম?

তিনি বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার। তিনি বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শুভ্র গাত্রবর্ণ তাঁর। তিনি বলদেব, বলভদ্র, অমিত শক্তির অধিকারী। আপন বলে অতিশয় উন্নতির এক ঐশী নাম হচ্ছে 'বলভদ্র'। তিনি 'সংকর্ষণ', কারণ তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ। যোগমায়া সেই গর্ভ সংকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপন করেছিলেন, তাই তার নাম হলো 'সংকর্ষণ'। তিনি 'শেষনাগ'। নাগরাজ শেষের অবতার। তার মধ্যেই এই নাগ অবস্থান করতেন। দেখা যায়, মৃত্যুকালে যদুবংশ ধ্বংসের আগে, কৃষ্ণের মৃত্যুর পূর্বে যোগসমাহিত ধ্যানস্থ বলরামের মুখগহ্বর থেকে লাল রঙের হাজার-মুখোসাপ বেরিয়ে এসে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। 'বলরাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এরকম— 'বল' শব্দের অর্থ 'শক্তি', আর 'রাম' কথাটির অর্থ 'রমণ' বা 'আনন্দ'। আধ্যাত্মিকতার আনন্দ, একত্রে বলরাম, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে বলরামের আবির্ভাব।

দ্বাপর যুগে তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, ত্রেতা যুগে তিনি শ্রীরামের অনুজ। দুই যুগেই ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের শুভংকরী আদর্শে পরিচালিত ভ্রাতৃশক্তি। দুই যুগেই তিনি শ্রীবিষ্ণুর মূল আধার রাম ও কৃষ্ণের সহায়ক শক্তি, তাদের বহুবিধ বিপদের সহায়তাকারী। বলরাম গদাযুদ্ধে পারদর্শী এবং ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের শিক্ষাগুরু। □

কেবল ‘বিজেপি ঠেকাও’ ইস্যুতে মোদীর হাতই বেশি শক্ত হচ্ছে

দুর্গাপদ ঘোষ

প্রয়াত লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রেরণায় ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি তৈরি করে অনেক পার্টির উত্থান ঘটেছিল। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি লোকসভা কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর মতো প্রতাপশালী নেত্রীকে পর্যন্ত ধরাশায়ী করেছিলেন বাইসাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ানো সমাজতন্ত্রী রাজনীতিক রাজনারায়ণ। ২০১৯ সালে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী যেমন তাঁর ‘নিজের কেন্দ্র’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আমেথি থেকে জিততে পারবেন না বুঝতে পেরে কেরালার রায়নাড় কেন্দ্রেও দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে (১৯৭৭-এ) ইন্দিরা গান্ধী কর্ণাটকের চিকমাগলুর কেন্দ্র থেকেও দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি অবশ্য জিতে যান। তখন কংগ্রেসিরা স্লোগান দিতেন ‘রায়বেরেলি ভুল করেছে, চিকমাগলুর করেনি’। তখনই সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় (কংগ্রেসের বাইরে) জনসঙ্ঘই সেবার সবচাইতে বেশি, ৯৭ আসন দখল করে নিয়েছিল। এতে কংগ্রেস ছাড়াও অনেক কংগ্রেস বিরোধী দলও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রমাদ গুনতে থাকে। কংগ্রেস প্রথম থেকেই হিন্দু মহাসভা এবং পরে জনসঙ্ঘ-বিজেপি বিরোধী । বামেরা বাইরে বাইরে লোক দেখানো কংগ্রেস বিরোধিতা করলেও সবসময়ই কংগ্রেস ঘেঁষা। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে কমিউনিস্টরা আদতে সমাজতন্ত্রী বলে মনে করতেন। ইন্দিরা জমানায় বামমনস্ক ভি ভি গিরিকে দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে জিতিয়ে রাষ্ট্রপতি করার সময় কংগ্রেসও যে বামঘেঁসা সেটাও স্পষ্ট হয়ে যায়। তার পরেও একবার বামমনস্ক ডঃ জাকির হোসেনকে রাষ্ট্রপতি করার সময় ছাড়াও বেশ কয়েকবার বামেরা ‘ওয়াক আউট’-এর নাটক করে এবং ভোটদানে বিরত থেকে লোকসভায় কংগ্রেস সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে সিপিআই সব সময়ই কংগ্রেসের লেজুড়। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস তার পুরনো নির্বাচনী প্রতীক জোড়া বলদ ছেড়ে যখন গাই-বাছুর চিহ্ন গ্রহণ করে এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে যখন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব

দিয়ে পাঠান ইন্দিরা গান্ধী তখন সিপিএম নেতারাই স্লোগান দিতেন ‘দিল্লি থেকে এল গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই। ১৯৭৫ সালে চাপানো জরুরি অবস্থাকেও সিপিআই সমর্থন করেছিল। বাকি দলগুলো জনতা পার্টির সঙ্গে এলেও তাদের জনসঙ্ঘ বিরোধী নীতি বরাবরই বহাল ছিল। কারণ, সবাই মনে করতেন এবং এখনো মনে করেন যে জনসঙ্ঘ বা বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি হওয়া মানে ৮০ শতাংশ হিন্দুভোট ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সেটা হলে বাকিরা মুসলিম ভোট ভাগাভাগি করে পেলে কারও পক্ষেই সরকার গড়া সম্ভব হবে না। এমনকী ৩/৪ টে দল জোট বেঁধেও ক্ষমতায় যেতে পারবে না। সেজন্য সবার লক্ষ্য একটাই, হিন্দুভোট ভাগাভাগি করে যা পাওয়া যাবে তার সঙ্গে মুসলিম ভোট কিছুটা একচেটিয়াভাবে পেয়ে সরকারে পৌঁছে যাওয়া। যে কৌশলে এবারও পশ্চিমবঙ্গে মমতার দল ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই কারণেই বিজেপি-বিরোধী সমস্ত দলও নিরন্তর ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’-র বুলি আউড়ে থাকে। তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো বিজেপিকে ঠেকানোর নামে মুসলিম ভোট নিয়ে কেবল রাজনীতির কারবার চালিয়ে যাওয়া। সেজন্য বিজেপি বিরোধীরা দরকারে জোট বাঁধাবাঁধির ক্ষেত্রে কোনো নীতি-আদর্শের বালাইয়ের ধার ধারে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বস্তুত ১৯৬৭ এবং বিশেষ করে ১৯৭৭ থেকে কংগ্রেসের বাইরে অন্যান্য দলগুলোও জনসঙ্ঘ-বিজেপি ঠেকানোকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে। নানা বাহানা সৃষ্টি করেছে। যেমন বিজেপি নেতারা একই সঙ্গে বিজেপি এবং আরএসএসের সদস্য থাকতে পারবেন না। ১৯৭৮–৭৯ সালে যখন এই বাহানা প্রবল হয়ে ওঠে তখন বাজপেয়ী-আদবানির নেতৃত্বে জনসঙ্ঘ তা মেনে ‘দ্বৈত সদস্যতা’-র প্রশ্নে কৌশলী নীতি নেয়। উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে।

ফঃ ৫

কেননা, হিন্দু সমাজ সনাতন কাল থেকে সর্বধর্ম ও সর্বমত সহিষ্ণু। বহুত্ববাদী হিন্দু সমাজ কখনো রাজনৈতিকভাবে এককাট্টা হয়নি। কিন্তু তাতেও রক্ষা পায়নি ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়া জনতা পার্টি সরকার। বাজপেয়ীরা দ্বৈত সদস্যতার ক্ষেত্রে বিরোধীদের দাবি মেনে নিলেও ১৯৭৯ সালে চৌধুরী চরণ সিং-এর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় সে সরকারের পতন ঘটে। অচিরে ক্ষমতায় ফেরেন ইন্দিরা গান্ধী। এরপর ১৯৮০ সালে জনসঙ্ঘের নেতারা তৈরি করেন 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বিজেপি)। তাতে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী রাম জেঠমালনি, গোয়ালিয়রের রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়ার মতো বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ যোগ দিয়ে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেন। ফলে বিজেপি ঠেকাতে গিয়ে উলটে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির পথ আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু খালিস্তানি জঙ্গি দমনে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানের প্রেক্ষিতে দুই শিখ দেহরক্ষী সতবন্ত ও বিয়ন্ত সিংহের গুলিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রবল সহানুভূতি ভোটের জোরে কংগ্রেস স্বাধীনতার পর সবচাইতে বেশি ৪২০টি আসন পেয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হন। অন্যদিকে বিজেপি পায় মাত্র ২টো আসন। গোয়ালিয়র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হওয়া মাধবরাও সিন্ধিয়ার কাছে অটলবিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত পরাজিত হন। বিজেপি একটা আসন জেতে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। আর একটা মহারাষ্ট্র থেকে। এতে বিজেপি বিরোধীরা বর্ষাকালে শিউরে ওঠা কদম কেশরের মতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তাঁরা ধরেই নেন যে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে নির্বাচনী মাঠে সব সময় এক ছকে, একতরফা 'খেলা' হয় না। কদম কেশর শিউরে উঠলে খুব তাড়াতাড়ি ঝরেও যায়।

১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রার মাধ্যমে সারা ভারতে হিন্দু জাগরণের প্লাবন বয়ে যায়। সেই সুবাদে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মুক্তি ও রামমন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলন। আর সেই হিন্দু জাগরণ ঠেকাতে উঠেপড়ে নামেন কংগ্রেস-সহ তাবৎ বিজেপি বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রবল চাপের মুখে পড়ে (১৯৮৬ সালে) একদিকে রামজন্মভূমি মন্দিরের তালা খুলে দেওয়া অন্যদিকে শাহবানু মামলায় মৌলবাদীদের খুশি করার দু'মুখো কৌশল নিতে গিয়ে ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নাস্তানাবুদ হয়ে যান। বিজেপি এক লাফে ২ থেকে ৮৬ আসনে পৌঁছে যায়। বোফর্স কামান কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে কংগ্রেস থেকে কার্যত বিতাড়িত হওয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তখন জনতা দলের হয়ে একদিকে বামেদের অন্যদিকে বিজেপি-কে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রে জোট গড়ে প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু রামজন্মভূমি আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা এবং সেইসঙ্গে দিল্লির জামা মসজিদের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে এক কোটি টাকা অনুদান দিয়ে একদিকে হিন্দু বিরোধিতা অন্যদিকে মুসলিম তোষণ করতে গিয়ে তাঁর সরকারের পতন ডেকে আনেন। তবে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলেও বিজেপি ৮৬ থেকে ১১৩ আসনে পৌঁছে যায়। তার আগে ১৯৯১ সালের ২২মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামপুদুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাজীব গান্ধী তামিল জঙ্গি সংগঠন এল.টি.টি.ই-র এক সদস্যা ধানুর আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান। সেটাই ছিল এদেশে প্রথম মানববোমা বিস্ফোরণ। ভিপি সিং সরকারের পতন ঘটতেই কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করে প্রধানমন্ত্রী করে চন্দ্রশেখরকে। কিন্তু রাজীব গান্ধীর ভয়ংকরভাবে মৃত্যুর পর সে বছরের ২১ জুন সহানুভূতি ভোট পেতে তড়িঘড়ি চন্দ্রশেখরের সরকারকে ফেলে দিয়ে ভোটে যায় কংগ্রেস। সেবার নিশ্চিত হারের বদলে সহানুভূতি ভোটের জোরে ক্ষমতায় ফেরে কংগ্রেস। কিন্তু একেবারে খাদের কিনারায় থাকা গরিষ্ঠতায় বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'থিন মেজরিটি-তে। কংগ্রেসের মধ্যে অনেক আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রিত্বের তীব্র প্রতিযোগিতা চলে আসছিল। এবার পি ভি নরসিংহ রাও এবং শরদ পাওয়ারের মধ্যে শুরু হয় কে কার সভায় কত বেশি লোক জড়ো করে নিজের নেতৃত্বের জোরের প্রদর্শন করবেন। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের মেডাক কেন্দ্র থেকে জিতে প্রধানমন্ত্রী হন রাও। পাওয়ারের সব কৌশল ভেস্তে যায়। অন্যদিকে রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে বাবরি মসজিদ সমর্থকরা তীব্র বিজেপি বিরোধিতায় নেমে পড়েন। ততদিনে ক্ষমতাছাড়া হয়ে জনতা দলও ছত্রখান হয়ে যেতে থাকে। ক্রমে ৩/৪ টুকরো হয়ে যায়। ১৯৯০ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হন মুলায়ম সিং যাদব। কল্যাণ সিং-এর মুখ্যমন্ত্রিত্বে সরকার গড়ে বিজেপি। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানেও বিজেপি সরকার গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের রোষানলে ধূলিসাৎ হয়ে যায় বাবরি কাঠামো। কেন্দ্রের রাও সরকার উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানেও জন নির্বাচিত বিজেপি সরকারকে ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করে। নিষিদ্ধ ঘোষণা হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-কেও গাজোয়ারি করে নিষিদ্ধ করা হয়। এতে হিন্দু ভাবাবেগ আরও বেশি ক্রুদ্ধ ও সংহত হতে থাকে। খুব দ্রুতভাবে কংগ্রেস-সহ বিজেপি বিরোধীদের শক্তিক্ষয় শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালে ২০৬ আসন পেয়ে তখন সমমনস্ক কিছু দলের সঙ্গে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স' (এনডিএ) গড়ে প্রথমে ১৩ দিন, তারপর ১৩ মাস এবং শেষে পূর্ণ সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। সেই হিসাবে বাজপেয়ী ৩ বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর তৃতীয় বারের সেই সরকারে কিছুদিনের জন্য রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন টিএমসি নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। আরও কিছু আঞ্চলিক দল তখনও ভেতরে ভেতরে বিজেপি বিরোধী থাকলেও কংগ্রেসের বিরোধিতা করে শক্তিশালী হয়ে ওঠার জন্য বাজপেয়ী সরকারকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। তারা সরকারের শরিক হয়েও বাইরে বিজেপি বিরোধিতা চালিয়ে যেতে থাকে। এনডিএ সরকার প্রচুর ভালো কাজ করেও ২০০৪ সালে মুখ্যত ভুল ইন্টেলিজেন্স ইমপিউট বা ভুল গোয়েন্দা তথ্যের কারণে বাজপেয়ী তাঁর সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই নির্বাচনে যান এবং খুব অল্প ব্যবধানে তাঁর সরকারের পরাজয় ঘটে। সোনিয়া চেষ্টা করেও প্রধানমন্ত্রী না হতে

পেরে প্রধানমন্ত্রী করেন তাঁর বশংবদ ডঃ মনমোহন সিংহকে।

এ পর্যন্ত বিজেপি ঠেকাওবাদীদের মূল বিরোধিতা ছিল বিজেপি-র। কিন্তু তার সুচিমুখ ঘুরে যেতে থাকে ২০০২ সাল থেকে। বিজেপি-র পাশাপাশি বিরোধিতা শুরু হয় নরেন্দ্র মোদীর। ২০০০ সালে গুজরাটে বিজেপি নিতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে মোদীকে দিল্লির কার্যলয় থেকে গুজরাটে নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করেন বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রে তখন বাজপেয়ী সরকার। অনেকেই ভেবেছিলেন যে আরএসএসের প্রচারক এবং ট্রেনে ট্রেনে চা ফেরি করা হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে সরকার চালাতে পারবেন না। অতএব বিজেপি এবার ফের পতনের দিকে যাবে। উপরন্তু তখন আর অযোধ্যায় বাবরি কাঠামোর অস্তিত্ব না থাকায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণের আন্দোলনের ধারও অনেক স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার মাত্র কিছুদিনের মধ্যে ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি ভোরে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল রাজ্যের কচ্ছ এলাকা। তাছাড়া এর আগে মোদীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার ইতিহাসও ছিল না। যদিও তিনি যে একজন অতি কুশল সংগঠক এবং দুর্দম সাহসী ব্যক্তি তার সাক্ষাৎ প্রমাণ মিলেছিল কাশ্মীরের লালচকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার সময়। তখন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন বিজ্ঞানী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী। তিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর একাত্ম ভারত যাত্রা করে শ্রীনগরের লালচকে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মোদীই তখন সশস্ত্র ও ভয়াবহ সন্ত্রাস কবলিত কাশ্মীর উপত্যকায় গিয়ে তার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় ডঃ যোশীর সঙ্গেও ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী মোদী ভূমিকম্প বিধ্বস্ত গুজরাটে ত্রাণ ও পুনর্গঠনে যেভাবে সফল হন তা বলা বাহুল্য একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার মাত্র এক বছর পরেই ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের ৬ নম্বর কামরায় বাইরে থেকে পেট্রোল ঢেলে অযোধ্যা ফেরত ৫৮ জন রামভক্ত করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিক্রিয়ায় গুজরাট জুড়ে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তা নিয়ন্ত্রণ করলেও তাবৎ বিরোধীদের ক্রোধ গিয়ে পড়ে মোদীর ওপর। সবাই ভীমরুলের মতো ছেঁকে ধরেন মোদীকে। সোনিয়া গান্ধী তো তাঁকে 'মওত কা সওদাগর' বা মৃত্যুর কারবারি বলতেও বাকি রাখেননি। কিন্তু একজনও বিরোধী নেতার মুখে গোধরার সেই নারকীয় কাণ্ডের নিন্দা শোনা যায়নি। ৫৮ জন মানুষকে নারকীয়ভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মরার ঘটনায় কাউকে সামান্য দুঃখটুকুও প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। উলটে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু যাদব আলাদাভাবে নিজের মতো একটা কমিশন তৈরি করে প্রচার করেন যে করসেবকরা নিজেদের সঙ্গে করে আনা পেট্রোল ঢেলে নিজেরাই তাদের কামরায় আগুন লাগিয়েছিল, বাইরে থেকে কেউ আগুন লাগায়নি। এহেন নিকৃষ্ট ধরনের সাম্প্রদায়িকতায় সারা দেশের হিন্দু সমাজের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। বিজেপি ও মোদী বিরোধীদের লাগামছাড়া মুসলিম তোষণের ব্যাপারগুলো যত বেশি সামনে চলে আসতে থাকে, হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াও তত প্রবল হতে থাকে। তাবৎ বিরোধীরা যত বেশি মোদী বিরোধী হুংকার দিতে থাকেন হিন্দু সমাজ তত বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। মোদীকেই একমাত্র হিন্দুর রক্ষক তথা দেশ কল্যাণকারী শক্তিশালী নেতা বলে মনে করতে থাকেন। গুজরাটে পরের এবং তারপর পরপর আরও দুটো নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে লাগাতার সরকার গড়ে যেতে থাকেন মোদী। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি উপবাস যাত্রা শুরু করেন। সেইসব অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল নামা দেখে বিজেপি-র তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং-এর অনুমোদনে মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ হিসাবে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে নস্যাৎ করে অনেকে, এমনকী রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও মনে করেছিলেন যে অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান তথা বাজপেয়ী মন্ত্রীসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী থাকা আদবানী এবং প্রাক্তন ও সফল বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মতো নেতাদের বদলে নরেন্দ্র মোদী জাতীয় রাজনীতিতে কোনও দাগ কাটতে পারবেন না। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মোদীর নেতৃত্বে 'উন্নয়ন'-কে সামনে রেখে সেবারের নির্বাচনে বিজেপি একাই ২৮৬ টি আসনে জিতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের মতে কেবল 'বিকাশ পুরুষ'-ই নয়, সেবার মোদীর প্রকৃত জয় এসেছিল বলিষ্ঠ 'হিন্দু নেতা' হিসাবেই। প্রধানমন্ত্রী হয়ে মোদী ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' স্লোগান তুলে উন্নয়নমূলক নানা ব্যবস্থা নিতে থাকেন। তার আগের দশ বছর দেশে কোনো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলে মনেই হতো না। কিন্তু মোদী আসার পর হঠাৎ করেই সারা দেশ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। মোদীকে সামনে রেখে বিজেপি মহরাষ্ট্র-সহ একের পর এক বড়ো ছোট রাজ্যেও সরকার গড়ে যেতে থাকে। একটা সময় চলে আসে যখন ১৯টা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুহূর্তে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরি-সহ ১৫টা রাজ্যে বিজেপি এককভাবে অথবা জোট করে সরকারে রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেবলমাত্র মিজোরাম ছাড়া বাকি ৬ রাজ্যেই সরকারে রয়েছে বিজেপি। 'তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়েছে' বলে মাঝে মাঝেই দম্ভ প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে ত্রিপুরায় দীর্ঘ দিনের বাম সরকারকে উৎখাত করে সরকার গড়েছে কিন্তু বিজেপি। বস্তুত মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-র এই দ্রুত উত্থান এবং ক্ষমতা দখল করা দেখে বিরোধীদের মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। এমনকী তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরাও মোদী বিরোধিতায় নেমে পড়েন। জাতীয় স্তরের পুরস্কার পাওয়া পদক সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার হিড়িক শুরু হয়। এমনকী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও 'অসহিষ্ণুতা'-র কথা বলে ঊষ্মা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিহার বিধানসভার নির্বাচনের পরই পদক ফেরতের নাটক বন্ধ হয়ে যায়। 'মোদীর অসহিষ্ণুতা' রাতারাতি কর্পূরের মতো উবে যায়। এমনকী কেউ কেউ পদক ফিরিয়ে নিতেও এগিয়ে আসেন। প্রসঙ্গত, পদক ফেরানো শুরু

করেছিলেন প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর এক নিকট আত্মীয়া। অন্যদিকে মোদী কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে সারা দেশের নগরে-শহরে-গ্রামগঞ্জে স্বচ্ছতা অভিযানে নামেন। কোটি কোটি পায়খানা-বাথরুম তৈরি করে যেতে থাকেন। 'উজ্জ্বলা' প্রকল্প নিয়ে দরিদ্রদের রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা করতে থাকেন। বিদেশি পণ্যের আমদানি কমিয়ে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা 'ভারতে তৈরি করো প্রকল্প' নেন। এছাড়া দুর্নীতি দমন ও দাঙ্গামুক্ত ভারত গড়ার কাজেও অন্তত এখন পর্যন্ত দারুণভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। পরপর দু'দফায় তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালের প্রায় সাড়ে সাত বছরের মধ্যে দেশে উল্লেখ করার মতো কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে দেননি। বলা যেতে পারে এটা তাঁর জমানায় অন্যতম বড় সাফল্য। সামান্য কয়েকটা ছোটখাটো ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দাঙ্গাবাজরা বড়ো ধরনের দাঙ্গা বাধাতে সাহস করেনি। সারা দেশে সড়ক নির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহহীনদের জন্য আবাস যোজনা নিয়ে বহু সড়ক ও গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন। মোদীর নানাবিধ সাফল্যের মুকুটে একটা যে খুব বড়ো পালক সংযোজন হয়েছে তা হলো সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষদের জন্য একটা টাকাও জমা না করে 'জিরো ব্যালান্সে' ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিয়ে সরকারি অনুদানের অর্থ সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমার ব্যবস্থা। সর্বদা শান্ত ও নিরহংকারী ভাবমূর্তি বজায় রাখা ছাড়াও 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' এবং এ বছরের ১৫ আগস্ট তার সঙ্গে 'সবকা প্রয়াস' স্লোগানে, মুসলিম মহিলাদের স্বামীগৃহ থেকে যে কোনো মুহূর্তে বিতাড়িত হবার আতঙ্কমুক্ত করার জন্য 'তিন তালাক' বন্ধের আইন প্রণয়নের মতো যে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তার মোকাবিলা করতে পারেননি বিজেপি বিরোধীরা। র‍্যাফেল যুদ্ধবিমান কেনায় দুর্নীতির অভিযোগের মতো ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে অভিযোগ চালিয়েও মোদীর রথের গতি মন্থর করতে পারেননি। রাজ্যসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জোরে একের পর এক আইন পাশ করিয়ে নিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কোনো বিজেপি সরকারের গায়ে দুর্নীতির, সরকারি অর্থ লুঠপাটের কালির দাগ লাগতে দেননি। এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রে মোদী তথা রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকার মানে 'দুর্নীতিমুক্ত', 'দাঙ্গামুক্ত', 'স্বচ্ছ সরকার'। এইসব কারণে বিরোধীরা ক্রমাগত খাদের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৮৪ সালে যে কংগ্রেস লোকসভায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসন লাভ করেছিল ২০১৯ সালে তার প্রায় ১০ শতাংশে নেমে গেছে। এমনকী স্বীকৃত বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুও লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে মোদীর সাফল্যে বিজেপি গতবারের চাইতে আরও ১৭টা আসন বেশি অর্থাৎ ৩০৩ আসনে জিতে ফের কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে বিজেপি।

২০১৯-এ দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েই মোদী অন্য সমস্ত কাজের মধ্যে রামজন্মভূমি বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান ছাড়াও দু' দুটো দুঃসাহসসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেনাদের ওপর জঙ্গি হামলার বদলা নিয়ে সীমান্তের ওপারে বালাকোটে বায়ুসেনার বিমান পাঠিয়ে একের পর এক বোমা বর্ষণ করে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পাকিস্তানকে প্রায় দাবড়ে দিয়ে তাদের হাতে আটক বায়ুসেনার এক অফিসার অভিনন্দনকে সসম্মানে ভারতে ফিরিয়ে আনার রোমাঞ্চকারী ঘটনাও ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া সংবিধানের ১০২ তম সংশোধন ঘটিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত ধারা ৩৭০ ও ৩৫-এ বাতিল করে দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বৌদ্ধ অধ্যুষিত লাদাখকে পৃথক করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে। আর জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা বজায় রেখে কেন্দ্রশাসিত এলাকা ঘোষণা করে দিয়েছেন। এখন বিধানসভা ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস ঘটানো হচ্ছে। তা সম্পূর্ণ হলে এবং পরিস্থিতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল হলে বিধানসভার নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। জঙ্গি দমন এবং পাকিস্তান থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধে সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের দিক থেকে মাঝে মাঝেই পরমাণু বোমার হুমকিকে অগ্রাহ্য করে নরেন্দ্র মোদি শুনিয়ে রেখেছেন যে ভারত 'দীপাবলী উৎসবের জন্য পরমাণু বোমা বানিয়ে রাখেনি'। এমনকী পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পাকিস্তান যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করে। একদিকে ডোকলামে অন্যদিকে লাদাখের গলওয়ানে চীনা সেনাবাহিনী পিএলএ-কে পিছনে হঠতে বাধ্য করেছে মোদী সরকার। মোদী পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কেবল পাক জবরদখলিকৃত কাশ্মীরের পুনরায় ভারতভুক্তির মাধ্যমেই কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। ভারতের স্বার্থবাহী এই সমস্ত নীতি গ্রহণ এবং কার্যকর করার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মোদী তথা বিজেপি-র প্রতি জনসমর্থন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজেপি বিরোধীরা তত বেশি কোনঠাসা হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁরা এখন যে কী বলবেন বা কী করবেন, কে কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন তা ঠিক করতেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন।

গোধরায় নৃশংসতা পরবর্তী গুজরাট দাঙ্গার সময় সোনিয়া গান্ধী মোদীকে 'মোওত কা সওদাগর' বলে কংগ্রেসের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু তাতেও কংগ্রেস নেতাদের হুঁশ ফেরেনি। মোদীর প্রথম দফার সরকারের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর রাহুল গান্ধী দুঃখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিলেন মোদী 'খুন কা দালালি কর রহে হ্যাঁয়।' মোদী রক্তের দালালি করছেন। রাহুল কাদের রক্তের কথা বলেছিলেন? সশস্ত্র জঙ্গিরা যারা ভারতের সাধারণ মানুষ এবং সেনাদের রক্তপান করছে তাদের রক্তের কথা বলেছিলেন কী না, বিজেপি বিরোধিদের কারো মুখ থেকে সে সম্পর্কে একটা বাক্যও বেরোয়নি। মমতার গলা থেকেও না। বিগত দু'দশকের বাস্তব চিত্র হলো, ক্রমাগত পিছু হঠতে হঠতে অন্যরা বাকি সমস্ত ইস্যুকে একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল 'বিজেপি ঠেকাও' ইস্যুর ওপর নির্ভর করছেন। এটা করে করে একদিকে নিজেদের খাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যেকথা বাম নেতাদের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, অন্যদিকে মোদীর হাতই বেশি শক্তিশালী হচ্ছে। হর্ষ গুপ্তা মধুসূদনের মতো অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও পর্যালোচকের মতে 'No Mo is still The Man For India'.— সারা ভারতে নরেন্দ্র মোদীই এখনো একমাত্র বিকল্প। (শেষ)

সিউড়িতে ঐতিহাসিক শ্রীরাধিকা বিগ্রহের সেবাপূজা

বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভাধর কবি সাধক গোবিন্দদাস কবিরাজের ভিটেতে পূজিত শ্রীরাধিকা বিগ্রহ আজও সেবিত হয় বীরভূমের সিউড়িতে। পুণ্যতিথিতে অমৃত অভিষেকে মহাস্নানে শ্রীরাধা অষ্টমী পালিত হয় শ্রীরাধা ব্রজকিশোর কুঞ্জে। পরিবারের গৃহদেবতার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। সিউড়ি বারুইপাড়ার সেনগুপ্ত পরিবারের সদস্যদের কথায়, ভক্ত কবি গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি। বাঙ্গলা বৈষ্ণব সমাজের কুলতিলক শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশে গোবিন্দদাস মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার কাছে তেলিয়া- বুধুরী গ্রামে উপনীত হন। গুরুর নির্দেশে সেখানেই তিনি বসবাস করতে থাকেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্য বুধুরী গ্রামে শিষ্য গোবিন্দদাসের কাছে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সময় তিনি গোবিন্দদাসের মুখে তাঁর রচিত পদাবলী গান শুনতেন। এই সময়েই শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরোধে গোবিন্দদাস গীতামৃত রচনা করেন। মুগ্ধ শ্রীনিবাস তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবিন্দদাস ছিলেন সৌন্দর্যের কবি, রূপানুরাগের কবি। তিনি ভক্তি ও রূপের এক নিবিড় ঐক্যসাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর পদগুলি ভাষা, অলংকার ও ছন্দের সৌন্দর্যে এবং ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের রূপসৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমা সৃজনে তিনি একজন বিখ্যাত কবি ও সাধক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর শেষ জীবন তেলিয়া-বুধুরীর পশ্চিমপাড়াতেই

অতিবাহিত হয়েছিল। কবিকুল চূড়ামণি গোবিন্দদাস নিজের ভিটে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলাতে গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবাপূজা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে যা বৈষ্ণব সমাজের কাছে শ্রীপাট বুধুরী নামে খ্যাত হয়। উত্তরকালে শ্রীরামদাস বাবাজীর ঐকান্তিক উদ্যোগে শ্রীপাট সেবা উজ্জ্বল হয়। সেই শ্রীপাটে সেবিত হতেন শ্রীরাধিকা বিগ্রহ। সেনগুপ্ত পরিবারের দাবি, এই গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রীপাটের অন্যতম সাধক শ্রীকিশোরীচরণ দাস বাবাজীর উদ্যোগেই আশ্রমে সেবিত শ্রীরাধা বিগ্রহ তুলে দেওয়া হয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রিয় সাধক শম্ভুনারায়ণ গোস্বামীর হাতে। পরবর্তী সময়ে সাধক শ্রীশম্ভুনারায়ণের সেবিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের ভিটেতে সেবিত শ্রীরাধা বিগ্রহ এক হয়ে যুগলরূপ ধারণ করে। নাম হয় ' রাধা ব্রজকিশোর'।

শম্ভুনারায়ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যসন্তান বীরভূমের সিউড়ির বারুইপাড়ার অচিন্ত্য সেনগুপ্তের হাতে সেই বিগ্রহ তুলে দেন। বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭২ সালে সিউড়ি বারুইপাড়ায় শ্রীরাধা ব্রজকিশোর মূর্তির সেবা শুরু হয়। সিউড়ির ওই বাড়ি এখন 'রাধাব্রজকিশোর কুঞ্জ' নামে সুপরিচিত। তারপর থেকেই গৃহদেবতাকে ঘিরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। পরিবারের সদস্যদের কথায়, ওই মন্দির প্রাঙ্গণে গত ৪৯ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রাস, ঝুলন, দোলযাত্রা, গোষ্ঠ উৎসব পালিত হয়। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেন, শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ মতো রাধা অষ্টমীতিথিতে মহাস্নান অমৃত অভিষেক করানো হয় বিগ্রহটির। পরে হয় শৃঙ্গার। রাজভোগ নিবেদিত হয়। গত ভাদ্র শুক্লা অষ্টমীতিথিতে শ্রীরাধারানির মূর্তিতে অমৃত অভিষেক মহাস্নানের আয়োজন হয়।

পঞ্চ তৈল, অষ্টাদশ উদক, অষ্ট তীর্থবারি, পঞ্চ কষায়, দ্বাদশ মৃত্তিকা, পঞ্চামৃত-সহযোগে ১০৮ রকম উপাচারে বিশেষ স্নান অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্নান শেষে নতুন বস্ত্রে শৃঙ্গার, পুষ্প অভিষেক ও বিশেষ ভোগের আয়োজন হয়। তালের বড়া, লুচি, মালপোয়া, দশরকম পিঠে, মাখন মিছরি, দুধ,দই, মধু, ফল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি উপাচার নিবেদিত হয়। রাধা অষ্টমীর মহাস্নান দেখতে ভিড় জমান আশেপাশের লোকজন। []

চরক

'যে চিকিৎসক জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে রোগীর কাছে প্রবেশ করতে পারেন না, তিনি রোগের চিকিৎসাও করতে পারেন না। চিকিৎসক প্রথমে রোগীর রোগের উপর প্রভাবকারী সমস্ত কারণগুলি খুঁটিয়ে দেখে তবেই চিকিৎসা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেন। একথা ভুললে চলবে না যে, রোগীর উপর তার পরিবেশও প্রভাব বিস্তার করে। রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' এই কথাগুলি আজকের দিনে অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ কথা মনে হলেও মনে রাখতে হবে যে, চরক আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ 'চরক সংহিতা'য় এগুলো লিখে রেখে গেছেন। শারীরতত্ত্ব, নিদানবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করে গেছেন, সেগুলো লোকে আজ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

পাচন (ডাইজেশন), বিপাক (মেটাবোলিজম), অনাক্রম্যতা (ইমিউনিটি) ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা চরকই প্রথম আমাদের দেন। তাঁর মতে বায়ু, পিত্ত, কফ —এই ত্রিদোষের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের উপরে শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে। খাদ্যের উপর রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি ধাতুর প্রতিক্রিয়ায় এই ত্রিদোষের সৃষ্টি। একই পরিমাণ খাদ্য থেকে বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন মাত্রায় এই ত্রিদোষের সৃষ্টি হয়। সেজন্য কারুর গঠন দুর্বল, কারও-বা মজবুত, কেউ মোটা, কেউ-বা রোগা।

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তিনি এই ত্রিদোষের অসামঞ্জস্যকেই অসুস্থতার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই সামঞ্জস্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি নানারকমের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা দিতেন। এ ব্যাপারে জীবাণুকে মোটেই গুরুত্ব দেননি।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণায়ক মুখ্য কারণ ইত্যাদি অনুবংশবিদ্যার (জেনেটিকস) মৌলিক তত্ত্বগুলি তাঁর জানা ছিল। শিশুর জন্মগত দৈহিক বিকৃতি (খঞ্জত্ব বা অন্ধত্ব) পিতা-মাতার দৈহিক ত্রুটির জন্য নয়। এই বিকৃতির গূঢ়তত্ত্ব যে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে সে কথা তিনি বলেছেন। আজও তাঁর কথা সত্য বলে মানা হয়।

মানুষের শরীরের গঠনপ্রণালী (অ্যানাটমি) এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাবলী সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বলেছেন, মানুষের দেহে দাঁত সহ মোট ৩৬০টি হাড় আছে। তিনি জানতেন যে, হৃদযন্ত্র থেকে সারা শরীরে তেরোটি প্রধান নাড়ী এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নাড়ী ছড়িয়ে আছে। সমস্ত নাড়ীর সাহায্যে শুধু যে পোষক বস্তুই শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় তা নয়, এগুলির দ্বারাই আবার শরীরের অসার বস্তুগুলি নিষ্কাশিত হয়। তিনি এও জানতেন যে, এই প্রধান নাড়ীগুলির কোনও অংশে বাধা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন প্রকার রোগ বা দৈহিক বিকৃতি ঘটে থাকে। এই সমস্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে তাঁর একটি ভুল ধারণা ছিল। তিনি ভাবতেন যে হৃদযন্ত্রে মাত্র একটিই প্রকোষ্ঠ আছে।

সুপ্রচীন চিকিৎসক আত্রেয়ের তত্ত্বাবধানে অগ্নিবেশ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশদ তথ্য সংবলিত একটি গ্রন্থ লেখেন। কিন্তু পরে চরক যখন এই গ্রন্থটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন তখনই এই গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' নামে লোকপ্রিয় হয়। এরপর থেকে দু'হাজার বছর পর্যন্ত এই গ্রন্থই চিকিৎসাশাস্ত্রের আরকগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এক সময় এই গ্রন্থ আরবি, ল্যাটিন প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত চরকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনও তথ্যই জানা নেই। শোনা যায়, তিনি একজন সাধুর সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা পদব্রজে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ করতেন এবং পথে পীড়িতদের রোগ নির্ণয় ও শুশ্রূষা করতেন।

('আমাদের বৈজ্ঞানিক' থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

ক্ষুদিরাম বসু

বীর বিপ্লবী। ১৮৮৯ সালে ৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে জন্ম। ১৯০২ সালে মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। বিলাতি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশি প্রচার প্রভৃতি কাজে সক্রিয়তার জন্য পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেন। যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচারী কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার দায়িত্ব ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর উপর পড়ে। সেই উদ্দেশে তাঁরা মুজাফ্‌ফরপুরে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ভিন্ন ব্যক্তি বোমায় মারা পড়ে। বিচারে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর।
- রামমোহন রায়কে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয়।
- বাল গঙ্গাধর তিলককে 'ভারতের হীরে' সম্বোধন করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে।
- বৈয়াকরণ পাণিনি গান্ধারের লোক ছিলেন।
- অজন্তার গুহাচিত্রগুলি 'জাতক' থেকে চিত্রিত করা হয়েছে।
- বীরসা মুণ্ডাকে 'ধরতি আবা' বলা হয়।
- হিন্দু কলেজের বর্তমান নাম প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি।

ভালো কথা

পাখির জন্য খাবার ও জল

আমার মায়ের দাদু আনন্দমোহন সিংহদেব দুপুরে খাবার গ্রহণের আগে খাবারের কিছু অংশ বাইরে ফাঁকা জায়গায় একটি পাথরের উপর রেখে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল কাক কা কা রবে উড়ে এসে সেগুলি খেয়ে আবার কা কা রব তুলে চলে যেত। তিনি বিরানব্বই বছর ছয়মাস বেঁচেছিলেন। তাঁর ছেলে আমাদের দাদু শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব একটা পাত্রে জল এবং পাথরের উপর খাবার রেখে দেন। এখন কা কা রবে কাকেরা আর আসে না। তার বদলে ঘুঘু, রামবনি, নাম না জানা আরও দু-তিন রকম পাখি এবং পায়রার দল বাকুড়কুটুম, বাকুড়কুটুম রব করে খাবার ও জল খেয়ে উড়ে চলে যায়। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের আসা-যাওয়া লেগে থাকে।

রুদ্রপ্রতাপ সিংহ, দশম শ্রেণী, বরাভূম, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) মা টি বি ন	(১) তা হ ধা র্তা বি র্তা ক
(২) র স রা চ	(২) ল ম র বি নো থ ফ

১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) আপাদমস্তক (২) ধর্মাধিকরণ

১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) পরাশরসংহিতা (২) পরিসংখ্যানবিদ্যা

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (২) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দঃ দিঃ
(৩) শুভম সেন, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৪) সপ্তর্ষি দেব, স্কুল ডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

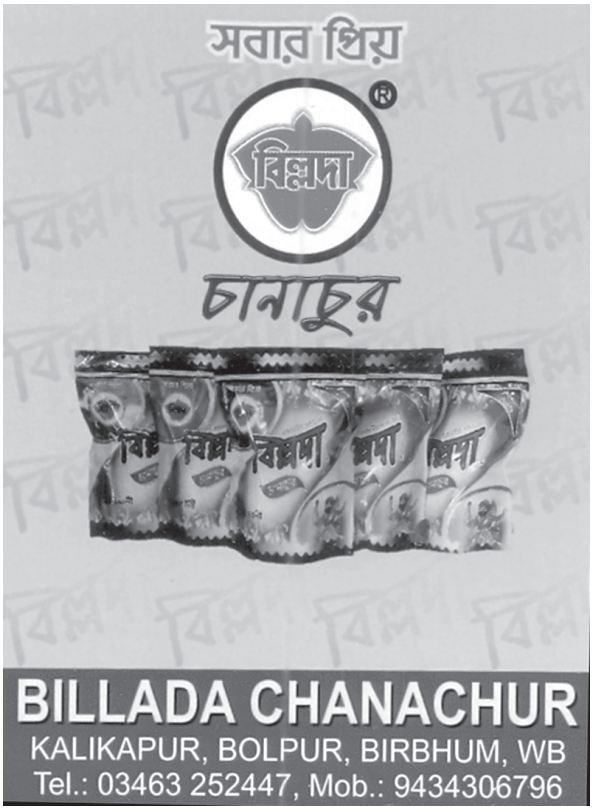

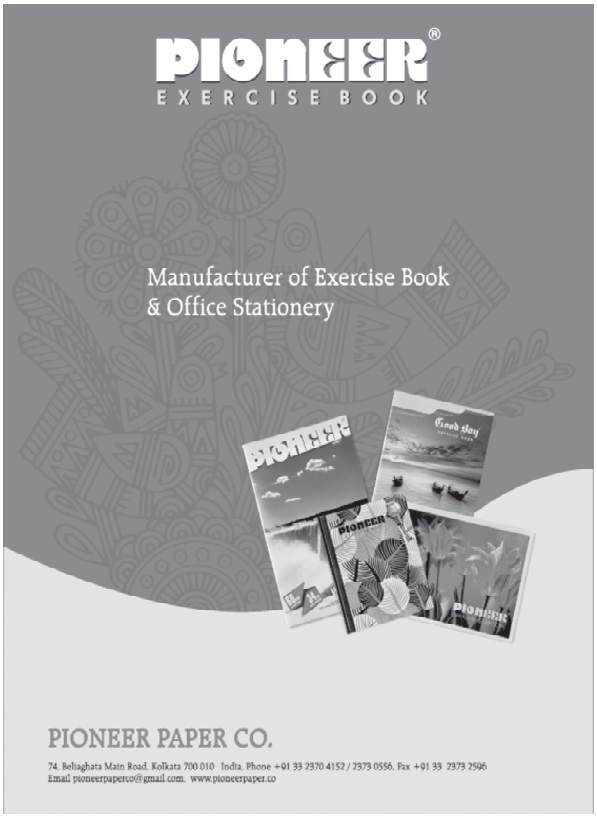

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কল্যাণ সিংহ ছিলেন কল্যাণপথের পথিক

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গরিব, বঞ্চিত, শোষিত, কৃষক, যুবক ও মহিলাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ যোগদানের জন্য চিরদিন মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে।

বিনোদ বনসল

'আমি এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেক বিন্দুর স্পষ্টীকরণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যে, আমি এবং সঙ্গী বা সহযোগীরা বা আমার সরকার কোনো প্রকারেই কন্টেম্পট অব কোর্ট করেনি। আমি কি গুলি চালিয়ে দিতাম? এনআইসি-র বৈঠকে আমি স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে, গুলি চালাব না, গুলি চালাব না, গুলি চালাব না।'

তিনি একবার দৃঢ়তার সঙ্গে এটাও বলেছিলেন যে, ৬ ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রী চৌহানজীর ফোন এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমার কাছে খবর আছে যে করসেবকরা গম্বুজের ওপর উঠে পড়েছে। আপনার কাজে কি খবর আছে?। আমি বললাম, আমার কাছে একধাপ আগের খবর আছে। ওরা গম্বুজ ভাঙতেও শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আপনি এই কথাটা লিখে নিন চৌহান সাহাব, 'আমি করসেবকদের ওপর গুলি চালাব না। কিন্তু হ্যাঁ, গুলি চালানো ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন আমি তা করছি।' কল্যাণ সিংজীর এই কথা আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়।

তাঁর সাহসকেও বাহবা দিতে হয়। এক প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'যদি কোর্টে কেস করতে হয় তো আমার বিরুদ্ধে কারো, তদন্ত কমিটি বসাতে হলে আমার বিরুদ্ধে বসাও, কাউকে শাস্তি দিতে হলে আমাকে দাও।' যখনই বাবরি কাঠামোর ইট পড়তে শুরু করল, বীরত্বের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংজী নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন। তারপর মিডিয়ার সামনে এসে বলেছিলেন, 'এর জন্য আমার কোনো আফশোস নেই, কোনো দুঃখ নেই, কোনো অনুশোচনা নেই। এই সরকার রামমন্দিরের নামেই তৈরি হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার রাম মন্দিরের নামে উৎসর্গীকৃত। রামমন্দিরের জন্য একবার কেন শত বার গদি ত্যাগ করতে পারি। কেন্দ্র সরকার যে কোনও সময় আমাকে গ্রেপ্তার করাতে পারে। কারণ আমিই হলাম সেই মানুষ যে নিজের দলের বড়ো উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেছে। কল্যাণ সিংহকে ইতিহাসপুরুষ আখ্যা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশ্ব বিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি তথা শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসের মহাসচিব চম্পৎ রাই। তিনি গত ২১ আগস্ট বলেন, 'বাবুজীর দেহবসান ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি, তথাপি আগামীদিনে তিনি 'ইতিহাসপুরুষ' নামে প্রসিদ্ধ হবেন। নিরস্ত্র রামভক্তদের ওপর গুলি না চালানো এবং ৬ ডিসেম্বর ও তার আগে অযোধ্যায় সরকারি আধিকারিকরা যা কিছু করেছেন আমার নির্দেশেই করেছেন। তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার--- এমন ঘোষণা করার সাহস রাখতেন তিনি। তাঁর রাজনীতির জীবন অনুকরণীয়। আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। পরমপিতা ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন— এই কামনা করি।' তাঁকে শ্রীরাম মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর আখ্যা দিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোষাধ্যক্ষ এবং প্রবীণ কার্যকর্তা আলোক কুমার বলেন, 'হিন্দুত্বের অগ্রণী সৈনিক কল্যাণ সিংজীর দেহাবসানের দুঃখজনক খবর পেলাম। তিনি অযোধ্যার রামমন্দিরে ভিত্তিভূমিতে আছেন, আবার সর্বোচ্চ শিখরেও আছেন। তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন @VHP Digital-এর মাধ্যমে এক টুইটে বলেছেন, 'বাবরি কাঠামো ধ্বংসের সমস্ত দায়ভার নিজের ওপর নেওয়া উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রখর রামভক্ত কল্যাণ সিংজীর দেহাবসানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করছে। ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'।।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'কল্যাণ সিংজীর মা-বাবা তাঁর নাম কল্যাণ রেখেছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে তার নামের সার্থকতা রেখে গেছেন। তিনি কল্যাণ সিংহ এবং জনকল্যাণকেই নিজের মন্ত্র করেছিলেন। তিনি বিজেপি জনসঙ্ঘ এবং পুরো পরিবারকেই নিজের জীবন সমর্পিত

ফঃ ৬

করেছেন। কল্যাণ সিংজী পুরো ভারতের কোনায় কোনায় এক বিশ্বাসের নাম হয়ে গিয়েছেন। একজন দায়িত্ববান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নাম হয়ে গিয়েছেন। জীবনের অধিকাধিক সময় তিনি জনকল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকতেন।'

অন্য এক বক্তব্যে তিনি বলেন যে, 'আমরা এক শক্তিশালী নেতাকে হারালাম। আমি প্রার্থনা করছি, প্রভু শ্রীরাম কল্যাণ সিংহজীকে তাঁর চরণে স্থান দিন। প্রভু রাম তাঁর পরিবারের এই সংকটের সময় এই দুঃখ সহন করবার শক্তি প্রদান করুন।'

১৯৩২ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে কল্যাণ সিংজীর পাঁচ দশকের অধিক রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যেক কালখণ্ডের স্মৃতি এক বিশেষ শক্তির সঞ্চার করে। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের মন্দির নির্মাণ মহাযজ্ঞে নিজের বলিদান হোক কিংবা সংকল্প পূর্তির জন্য শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করাই হোক, দূরদর্শী নীতির দ্বারা নতুন শাসকের কাছে উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করাই হোক কিংবা জনকল্যাণে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়াই হোক— কল্যাণ সিংহের নাম সবসময় স্মরণ করা হবে।

গ্রামের গলিঘুঁজি থেকে রাজনীতিতে সিংহস্বরূপ হওয়া উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তনমুখ্যমন্ত্রী, দুই রাজ্যের রাজ্যপাল এবং রামমন্দির আন্দোলনের প্রণেতা কল্যাণ সিংজী ২০২১-এর ২১ আগস্ট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু ধর্ম, রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থাতে তিনি যে উদাহরণ রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। একদিকে লালুপ্রসাদ ও মুলায়ম সিংহের মতো নেতা যেখানে রামদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত, সেখানে কল্যাণ সিংহজীকে সর্বদা রামভক্ত হিসেবেই চিরকাল স্মরণ করা হবে।

এক প্রবন্ধে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ লিখেছেন, 'উনি ব্যবস্থা সঞ্চালনায় যেমন কঠোর ও ধমকের প্রয়োগধর্মী ছিলেন তেমনই লোকজীবনে গ্রামরাজ ও লোকরাজের পক্ষে ছিলেন। তাঁর সূত্র ছিল যে শাসন ব্যবস্থা ধমক এবং প্রতাপের দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে সিস্টেম ভেঙে পড়ে না। রাজনেতার কাজ সিস্টেমকে সচল রাখা'। বৈচারিক দৃষ্টিতে তিনি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই জন্য তার ভাবনায় সমাজের প্রত্যেক পীড়িত ও বঞ্চিত ব্যক্তির দুঃখদুর্দশা এবং তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা থাকত। একাত্ম মানবদর্শনের বিশ্লেষণে তিনি বলতেন, 'পেটের খাবার, মনের ভালোবাসা, মস্তিষ্কের বিচার এবং আত্মার সংস্কার— এই চারের সমন্বয়ই হলো একাত্ম মানবদর্শন। তাঁর ভাবনা ছিল 'অন্ন-বস্ত্র- বাসস্থান মানুষের চাওয়া-পাওয়ার একটা দিকমাত্র। এর দ্বারা মানবতা পরিপূর্ণ হয় না। পেটের জন্য খাবার প্রয়োজন কিন্তু মানুষের কাছে অন্তঃকরণ বলে একটা বস্তু থাকে যার শুধু ভালোবাসা প্রয়োজন। আসলে অন্তঃকরণ সেটাই যেটা স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতির দ্বারা প্লাবিত হয়। সহানুভূতির অর্থ পীড়িত ব্যক্তির সমান ব্যথা অনুভব করা। এর সামনে সহানুভূতি একটা সীমিত অর্থের শব্দ— এই সমস্ত বিচারে সহজেই ধারণা করা যায় যে কল্যাণ সিংহ একেবারে পঙ্‌ক্তির শেষে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কত গভীর সমবেদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৯১-১৯৯৯-এর সীমিত কালখণ্ডে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এই ছোটো কালখণ্ডে বড়ো যশস্বী তাঁর নাম। শিক্ষার ক্রমাগত নিম্নগামী মানের আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ 'নকল বিরোধী আইন' প্রণয়নের সাহস তিনিই দেখিয়েছিলেন। অপরাধকারীদের ওপর কঠোর হওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশে 'স্পেশাল টাস্কফোর্স'-এর গঠন আজও সন্ত্রাসবাদী ও সমাজ বিরোধীদের জন্য প্রাণঘাতক। গ্রামের বিকাশের জন্য গ্রামপঞ্চায়েতগুলিতে 'গ্রাম সচিবালয়' তিনি করেছিলেন। কৃষকদের 'গ্রাম জোত বহী' যোজনার ফলে রাজ্যের অন্নদাতাদের আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বুন্দেলখণ্ডের মতো বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্যই তিনি 'পূর্বাঞ্চল বিকাশ নিধি' ও 'বুন্দেলখণ্ড বিকাশ নিধি' তৈরি করেছেন।

১৯৬৭ সালে মাত্র ৩৫ বর্ষীয় কল্যাণ সিংহ আলিগড়ের অতরৌলি বিধানসভা থেকে জিতে ইউপি বিধানসভাতে পৌঁছেছিলেন। যদিও ১৯৬২ সালে আলিগড়ের এই অতরৌলি বিধানসভা আসনে জনসঙ্ঘের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি পরাজিত হন, কিন্তু ১৯৬৭ পর্যন্ত ৫ বছরে তিনি নিজেকে পরিণত করে তুলেছিলেন, যার ফলে ১৯৬৭-তে তিনি বিজয়ী হবার পর একটানা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন। তিনি ৯ বার বিধায়ক হন। বুলন্দশহরের ডিবাই বিধানসভা থেকেও তিনি দু'বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি সেই আসন ছেড়ে দেন। তিনি দু'বার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন, ২০০৪ ও ২০০৯-এ দু'বার সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০১৪-তে তিনি রাজস্থানের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন।

কল্যাণ সিংহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ থেকে জনসঙ্ঘে এসেছিলেন। যখন জনসঙ্ঘ জনতা পার্টিতে বিলীন হয়ে যায় এবং ১৯৭৭-এ উত্তরপ্রদেশে জনতাপার্টির সরকার গঠন হয় তখন রামনরেশ সরকারে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ১৯৮০-র ৬ এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হওয়ার পরে পার্টির প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরই মধ্যে অযোধ্যা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাঁর গ্রেপ্তারির ফলে কার্যকর্তাদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রামমন্দির আন্দোলনের জন্য উত্তরপ্রদেশ সমেত সারাদেশে বিজেপির জোয়ার আসে এবং ১৯৯১-এর জুন মাসে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করে।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গরিব, বঞ্চিত, শোষিত, কৃষক, যুবক ও মহিলাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ যোগদানের জন্য অযোধ্যাতে রামমন্দিরের দিকে যাওয়া পথের নাম 'কল্যাণ মার্গ' রাখার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি সত্যিকারের কল্যাণ মার্গের পথিক ছিলেন, তিনি সর্বদা আমাদের প্রেরণা দান করতেন।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় প্রবক্তা)

জেরুজালেম তুমি কার ?

সুভাষ মোহান্ত

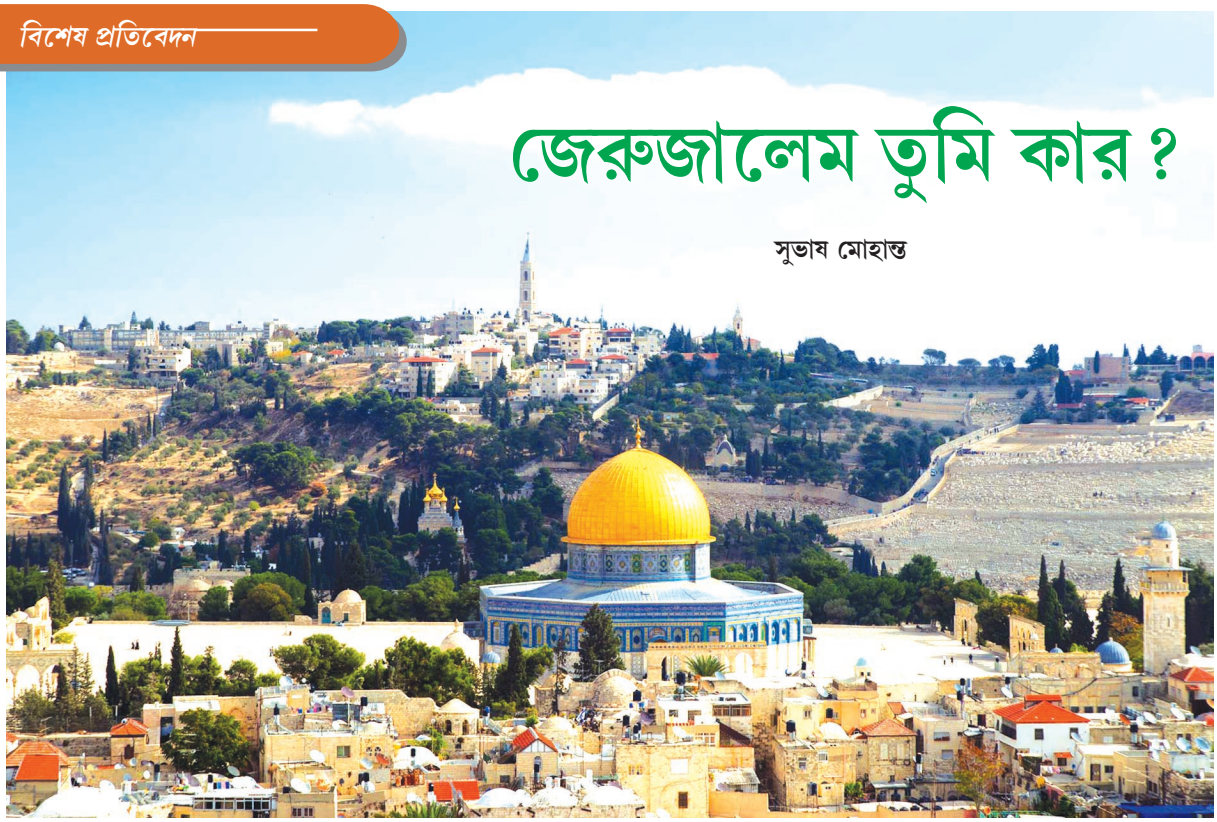

জেরুজালেমের অবস্থান : মধ্যপ্রাচ্যের একটি ছোটো দেশ ইজরায়েল। রাজধানী জেরুজালেম, যার আয়তন ৮০১৯-৮৫২২ বর্গ-মাইল, জলসীমা ১৭০ বর্গ-মাইল, ২.১ শতাংশ জল এবং জেরুজালেমের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ৩১°৪৭ উঃ, '৩৫°১৩' পূঃ। আরব ভূখণ্ডে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত।

ইহুদি কারা : পৃথিবীর যে কটা প্রাচীন ভাষা তথা শব্দ ভাণ্ডার রয়েছে তার মধ্যে 'হিব্রু' অন্যতম। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের বিধিবিধান যারা মেনে চলেন তারা জিউ বা ইহুদি নামে পৃথিবীতে পরিচিত। ইহুদি ধর্ম মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীনতম ধর্ম, যার আনুমানিক বয়স পাঁচ হাজার বছর। খ্রিস্টধর্মের বয়স দু'হাজার একুশ বছর। আর ইসলামের বয়স তেরশো ঊননব্বই বছর। জেরুজালেমের 'টেম্পল মাউন্ট' ইহুদিদের এক এবং অদ্বিতীয় ধর্মক্ষেত্র। ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাস টেম্পল মাউন্টকে জড়িয়ে আছে। আজও ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টকে পবিত্র জ্ঞান করে।

প্রতিবাদী খ্রিস্ট ধর্মের জন্মের পরে ইহুদিদের থেকে খ্রিস্টরা টেম্পল মাউন্টে অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে, যে কারণে জেরুজালেম (বেথলেহেম থাকা সত্ত্বেও) ইশাই বা খ্রিস্টদের ধর্মপীঠ। ইসলামিরা অনেক বেশি আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে খ্রিস্ট ও ইহুদিদের বিতাড়ন করে জেরুজালেমে তাদের অধিকার কায়েম করে। টেম্পল মাউন্টে তারা খাড়া করে 'হারাম আল শরিফ'। মক্কা-মদিনার পরে হারাম আল শরিফকে গুরুত্ব দিতে থাকে। বিষয়টা হলো, এক জেরুজালেম নিয়ে তিন-ধর্মের সংঘাত। জেরুজালেম থেকে খ্রিস্টানরা প্রায় বিতাড়িত। ইহুদিরা চালাচ্ছে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

ইহুদি নিধন যজ্ঞ : ইউরোপ কারণে-অকারণে মানবাধিকারের প্রতিভূ সাজে। এটা ইউরোপের সহজাত মজ্জাগত প্রবণতা। আজ মায়ানমারের (প্রাচীন বার্মা) রাখাইনের রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে যা ঘটছে, তা নিয়ে পৃথিবীর কোনও সভ্য মানুষ স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু রোহিঙ্গাদের বাস্তব ইতিহাস না জেনে ইউরোপীয় নেতাদের বাড়াবাড়ি কোন পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ইউরোপের দিকে তাকালে তাদের দ্বিচারিতা নিয়ে স্বভাবতই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জাগে। কিন্তু কেন এই দ্বিধা?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৯) সময় থেকেই জার্মানির অর্থনৈতিক সংকট বেড়েই চলেছিল। এই সুযোগে ১ এপ্রিল ১৯২০ সালে অ্যাড্‌লফ হিটলারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ন্যাশনাল সোশালিস্ট জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি বা নাৎসি পার্টি। চরম দক্ষিণপন্থী এই দল ১৯৩২ সালে ৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসে। ১৯৩৩-এ জার্মানির চান্সেলর হন হিটলার। ২৪ মার্চ বিশেষ আইনের সাহায্যে জার্মানির সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। ১৪ জুলাই নাৎসি ছাড়া সমস্ত পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হিটলার ধুয়ো তুললেন— 'জার্মানির অবক্ষয়ের জন্য ইহুদিরা দায়ী। শুধু জার্মানি নয় ইউরোপের কোথাও তাদের বেঁচে থাকবার অধিকার নেই'। বন্ধ হলো ইহুদি অ-ইহুদিদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক। নিষিদ্ধ হলো স্কুল-কলেজ- পড়াশোনা, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেঁচে থাকার অধিকার। দলে দলে ইহুদিদের ধরে অকথ্য নির্যাতনের সঙ্গে পাঠানো হতে থাকে কুখ্যাত 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে'। হাজার হাজার ইহুদি পালাতে থাকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে।

হিটলারের শক্তিশালী স্তাবক গোষ্ঠী যার মধ্যে ছিলেন জোসেফ গোয়েবল্‌স (মিথ্যাকে বারবার বলে সত্যে পরিণত করবার থিয়োরির জনক), হেরম্যান গোয়েরিং, হাইনরিখ হিসলার, রাইনহার্ড হেড্রিশ। এদের পরামর্শে ১৯৩৮-এর ৯-১১ নভেম্বর তিনদিনে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো অসংখ্য ইহুদি উপাসনালয়, দোকানপাট, বাড়িঘর। ১৯৪১ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) গোটা ইউরোপকে ইহুদি মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নাৎসি নেতারা। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১০ লক্ষের বেশি ইহুদিকে গুলি করে হত্যা করে নাৎসি বাহিনী।

বন্দিশিবিরে পৌঁছানোর পরে মহিলা-বৃদ্ধ- শিশুদের হত্যা করা হয় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে। প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে বিভিন্ন বন্দি শিবিরে হত্যা করা হয়। আত্মগোপনকারী, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা মাত্র ১৬০০০ ইহুদি বেঁচে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে (১৪ আগস্ট ১৯৪৫) তাদের উদ্ধার করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাস এমন বীভৎস নারকীয় হত্যালীলা আর দেখেছে কি?

মধ্য-প্রাচ্য ও শক্তি সাম্যতা : পৃথিবীর ভরকেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য, শক্তির কেন্দ্রবিন্দুও মধ্যপ্রাচ্য। পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মের জন্মের আঁতুড়ঘর মধ্যপ্রাচ্য। হিন্দু (আর্য), বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, ইহুদি, খ্রিস্ট, ইসলাম, শিখ। ইহুদি ধর্মের প্রতিবাদী হিসেবে খ্রিস্টধর্মের জন্ম। ঠিক যেমন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী হিসেবে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান।

মধ্যপ্রাচ্য ফুটন্ত শক্তি, অস্থিরশক্তি। ১৫০০০ বছর আগের ইতিহাস মুখ লুকিয়েছে সাহারার বুকে। কালের নিয়মে আজ যেটা মরু, কাল সেটা সবুজ শ্যামল, আজ যেটা সবুজ শ্যামল কাল সেটা মরু। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন যখন মধ্যপ্রাচ্যে দাবানল তৈরি করে তখন খাবারের সন্ধানে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, হানাহানি শুরু হয়, সেকারণে দিগ্‌বিদিক গমন এসব চলতে থাকে। এর মধ্যে ওই মরুর বুকে এক চিলতে ভূভাগ ছিল মরুদ্যান। জেরুজালেমকে বেষ্টন করে যার পরিধি কম-বেশি ৩০০ মাইলের মতো।

ফুটন্ত শক্তি মধ্য-প্রাচ্যের হানাহানির ইতিহাস দশ হাজার বছরেরও বেশি পুরানো। আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। এখনও সেখানে শক্তির জুলুমবাজি, কখনো ধর্মের জিগির, কখনো জেহাদি জিগির মানুষে মানুষে খুনোখুনি, মারামারি লেগেই আছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির দিকে তাকালেই এই চিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইহুদিদের উপর কেন এই আঘাত : ইহুদিদের অপরাধ, তারা মনে করে যে ইহুদিধর্ম খ্রিস্টান ও ইসলামিক মতের মা (বিষয়টার সারসত্যও আছে)। প্রাচীন ধর্মমত থেকে তাদেরকে নাড়ানো যায়নি, এই তাদের অপরাধ। তারা মেধা, বাণিজ্য বৃদ্ধিতে অগ্রণী (শরণার্থী ও নির্যাতিতদের জেনারেশন সবসময় শক্তিশালী হয়)। অপরাধ— মেরে মেরেও তাদের শেষ করা যায়নি। তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদি পিতা-মাতা আদম ও ইভের উপাখ্যান। তাদের আদি পুরুষ আব্রাহাম। আব্রাহাম পরবর্তী মোজেস প্রথমে ইজিপ্টে দাসত্ব করা একদল যাযাবরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর Ten Commandments হয়ে ওঠে হিব্রু বিশ্বাসের বনিয়াদ। তারাই প্রথম রুক্ষ জনহীন 'কনান প্রদেশে' (বর্তমান প্যালেস্টাইন) বসতি গড়েন। ক্রিট থেকে ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের অবাধে হত্যা করে সাজানো কনান প্রায় দখল করে ফেলে। শুরু হলো ইহুদিদের বাঁচার লড়াই। সউলের নেতৃত্বে ইহুদিরা রুখে দাঁড়ায়। এর পরে রাজা ডেভিড প্রথম জেরুজালেমে রাজধানী নির্মাণ করেন। রূপ দেন তীর্থক্ষেত্রের। ডেভিড পুত্র ইতিহাস বিখ্যাত জ্ঞানী সলোমন ইহুদি সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সুরক্ষা দান করেন। ৭৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আসিরীয়রা ইজরায়েল আক্রমণ করে হত্যালীলা চালায়। এই সময়ে বহু ইহুদি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ক্রুসেডের সময় ইহুদিদের উপর অত্যাচার বাড়ে। ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় পোপ ইনোসেন্ট ও নবম পোপ গ্রেগরি (১২৩৯) ইহুদিদের যিশু ও খ্রিস্টধর্ম বিরোধী বলে আক্রমণ করেন। সমস্ত ইহুদি গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলবার নির্দেশ দেন। ভস্মীভূত হয় কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার।

ইহুদিদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক করা, নাগরিকত্ব না দেওয়া, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ছিল নিত্যকার ঘটনা। এই দলে ইংল্যান্ড (১২৯০), ফ্রান্স (১৩২২, ১৩৯৪) স্পেন, পোলান্ড, ইতালি, রাশিয়া (১৯০৫) কোন দেশ নেই? আর জার্মানি! সে তো বিশ শতকের কালিমালিপ্ত ইতিহাস। শান্তির দেশ ভারতবর্ষেও পরোক্ষ ইহুদি মারণ যজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। আজমল কাসবদের মুম্বাই হানার অন্যতম স্থির ও পরিকল্পিত লক্ষ্য ছিল ইহুদি কলোনি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও জেরুজালেম প্রশ্নে 'ভারতের ইহুদি বিরোধী ভূমিকা বা ধরি মাছ না ছুঁইপানি'? ইতিহাস অস্বীকার ও অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহুদিরা তাদের নিজভূমি ইজরায়েলে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। রাজধানী হয় জেরুজালেম। ১৯৬৭-তে পুনরায় ইহুদি নিধন যজ্ঞের সলতে পাকানো হয়। এবার অবশ্য খ্রিস্টান নয়, আরব ভূখণ্ডের ছ'টি মুসলমান দেশ মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ইহুদিরা মরণ কামড় দেয়। এক সঙ্গে ছ'টি দেশকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। সেই থেকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ইহুদিদের ছোট্ট ভূখণ্ড (৮৫০০ বর্গমাইল) ঘিরে থাকা দেশগুলির মধ্যে। লাগাতার রুক্তক্ষয়ী সংগ্রামও চলছে। ২০০০ সালে মন ভোলানো চুক্তি হয়। বিল ক্লিন্টনের মধ্যস্থতায় চুক্তিতে সই করেন ইয়াসের আরাফত ও আইজ্যাক রবেন। আরাফতকে নোবেল প্রদান করা হয়। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ২০১৪-তে আবার যুদ্ধ। সে যুদ্ধেও প্যালেস্টাইনের পরাজয়। আবার চলছে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ বোনার কাজ। ট্রাম্প প্রশাসন (০৬-১২-২০১৭) জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করে। এতে এই ঘটনায় পৃথিবীর সমস্ত ইসলামি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে (ইসলামিক দেশ জোট) ইস্তাম্বুলে গোপন ষড়যন্ত্র চললো (১৫-১২-২০১৭)। রব উঠলো— 'ইসলাম বিপন্ন'। ফের শুরু হয়েছে, ইহুদিদের ঘিরে অশান্তির ক্ষেত্র রচনার কাজ।

গত মে মাসের ১০ তারিখে এ তাবৎ কালের সবচেয়ে বড়ো সংঘর্ষ শুরু করলো গাজা ও প্যালেস্টাইনে। হাজার হাজার দিশাহীন রকেট আছড়ে পড়তে থাকলো ইজরায়েলের বুকে। অজুহাত ইজরায়েল কোর্ট, গাজা ভূ-খণ্ডের দুটি বাড়ি ইহুদিদের অনুকূলে খালি করতে বলেছে। অজুহাত হলো ইজরায়েল মুসলমানদের 'হারাম-আল- শরিফে' নামাজ পড়তে বাধা দিচ্ছে। ইহুদিরা ভূমি বাড়াচ্ছে। ঠেকে শেখা ইজরায়েলের প্রত্যাঘাত মারাত্মক হয়ে উঠেছে। ৫৭টি মুসলমান দেশের প্রতিনিধিরা সৌদিআরবের ডাকে সম্মিলিত হলো দুবাইতে (১৬.০৫.২০২১)। ইসলামিক দেশ জোটের মিলিত সিদ্ধান্ত মুসলমান তথা প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়াতে হবে, দিতে হবে ইহুদিদের উচিত শিক্ষা। এই পক্ষে আরও যোগ দিতে পারে সমস্ত কমিউনিস্ট দেশ, যবন, বিধর্মীরা, অধর্মীরা। ইজরায়েলের পক্ষে বা মিত্রশক্তি জোটে চিরকালীন মিত্র আমেরিকা দাঁড়িয়ে আছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পাশে দাঁড়িয়েছে জার্মানি, ব্রাজিল, গ্রিস, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা-সহ বেশ কিছু ছোটো-বড়ো দেশ। এই পক্ষে আসতে পারে সমস্ত খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিন্টো, হেব্রাইস্ট, জুডাপন্থী, পারসিক (ইরানের প্রাচীন জনজাতি) জরাথুস্ট্রবাদী, বাহাই, কনফুসীয় ধর্মাবলম্বীরা।

ইহুদিদের এ যন্ত্রণার শেষ কোথায় আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার যে কটা কারণ ছিল, 'ইহুদি নিধন যজ্ঞ' ছিল তার মধ্যে অন্যতম। তাই আশঙ্কা কাজ করে, এই ইহুদি বিদ্বেষ আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ না হয়ে দাঁড়ায়! এপ্রিল ২০২৩ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে আবার তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা না বেঁধে যায়। ▯

জঙ্গি গ্রেপ্তার : সতর্কতা দরকার সর্বস্তরে

বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশ এই মাসের মাঝামাঝি তিন রাজ্য— দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ থেকে ছয় জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পুজোপার্বণের সময় দাঙ্গা বাঁধানো, বিস্ফোরণ ঘটানো ইত্যাদির মাধ্যমে জনজীবন ব্যাহত করার ছক ছিল জঙ্গিদের। তাদের মধ্যে দুজন অন্তত পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বলে তদন্তে প্রকাশ। দাউদ ইব্রাহিমের ভাই আনিসের মাধ্যমে এদেশে অস্ত্র চোরাচালান করে ভারতকে বারুদের স্তূপে পরিণত করার পরিকল্পনাও ছিল তাদের। আপাতত দিল্লি পুলিশ হেফাজতে নিয়ে দেখতে চাইছে ধৃত জঙ্গিদের সঙ্গে বাংলাদেশের জেএমবি জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগ কতটা। কারণ যে দুই জঙ্গি পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের খামারবাড়িতে অস্ত্র-প্রশিক্ষণের জন্য ছিল, তাদের জেরা করে জানা গিয়েছে ওখানে অন্তত বারো-পনেরো জন বাংলাদেশিও প্রশিক্ষণের জন্য ছিল। সুতরাং সব রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গকেও বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। কিছুদিন আগে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত করাবার প্রসঙ্গে অনেক টিভি-বিশেষজ্ঞ কটাক্ষ করেছিলেন, 'এটা কি জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার বিষয় যে এনআইএ তদন্ত করবে?' কেউ বা আরও একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা পুরোদস্তুর রাজ্যের বিষয়, এনআইএ তদন্ত হলে নাকি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করা হবে। আপাতত জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই পুজোর মরশুমে কোনো সন্ত্রাসবাদী ঘটনাকেই হালকাভাবে নেওয়া উচিত হবে না।

কিছুদিন আগেই 'স্বস্তিকা'র এই কলমে এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছিল, রাজ্যে

যে রাজনৈতিক হানাহানি চলছে, যাকে নির্বাচনোত্তর হিংসা বলা হচ্ছে, তার চরিত্র কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতোই প্রকাশ পাচ্ছে। আশঙ্কা, জঙ্গিরা এই সুযোগটাই গ্রহণ করবে।

এই রাজ্যে প্রতিবারই স্বাধীনতা দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবসের সময় বা পুজোর মরসুমে জঙ্গিহানার আশঙ্কা থাকেই। পুলিশ-প্রশাসনও তাই বাড়তি সতর্ক থাকে। কিন্তু প্রশ্নটা শুধু আইন- শৃঙ্খলা রক্ষার দায় কার— উত্তর অবশ্যই পুলিশ প্রশাসনের, তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টিও অনিবার্যভাবেই এখানে এসে পড়ছে।

জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনার পর অনেক বামমনস্ক মানুষ ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, 'ভোট এলেই জঙ্গি ধরা পড়ে'। ঠিক যেমন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকার সঙ্গে ভোটের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা। আসলে আমাদের জাতীয় স্বার্থের মতো বিষয়গুলিকে বার বার লঘু করে ভোটের স্বার্থ খোঁজার চেষ্টা করার প্রবণতা নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে। তাই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে অন্তত প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, বিরোধীরা ক্রমাগত জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কিছু বিশেষ ফ্যাক্টরের জন্য হয়তো আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্যস্তরে সাফল্য লাভ করছে, তারপর জোটের নামে ঘোঁট পাকানো, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার নামক মুখোশের আড়ালে ব্যতিব্যস্ত করা, আর সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া এদের যে আর বিশেষ কোনো কাজ থাকে না, সেটা নানা ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। বিরোধীদের এই প্রবণতার জন্যই জাতীয় নিরাপত্তা, দেশের স্বার্থ যেমন উপেক্ষিত হচ্ছে, তেমনি বিরোধীরাও মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

বিরোধীদের আশু টার্গেট এখন যেনতেনপ্রকারেণ আগামী বছরের মার্চে আসন্ন নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতা দখল করা। আর পাকিস্তানের মতো আমাদের শত্রুদেশ সেটা জানে বলেই তাদের জঙ্গি মডিউলগুলি এখন আচমকা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর পেছনে অনিবার্য ভাবেই হাত রয়েছে তালিবানদের। এবং এই জঙ্গিদের ভারতে পাঠিয়ে অস্থিরতা তৈরির পেছনে রয়েছে পাক-গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই- এর সঙ্গে বাংলাদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগসাজস। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আওয়ামি লিগ থাকুক আর যে কোনো দলই থাকুক না কেন, সেদেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করেই তাদেরকে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়। এতদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মানচিত্র নিয়ন্ত্রণ করত পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই, এবার সেই সঙ্গে তালিবানরাও যে নিয়ন্ত্রণ করবে, তা বলাই বাহুল্য। আর তাদের মূল টার্গেট যে ভারত হবে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে চীন-পাকিস্তানের সরকারের সমর্থন তারা যখন প্রকাশ্যেই পেয়েছে। এখানে দেশের পুলিশ- প্রশাসনকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে, 'সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না', 'তালিবানরা খারাপ, কিন্তু মুসলমান সৌভ্রাতৃত্ব- বোধ (ব্রাদারহুড) ভালো' এইসব তত্ত্ব যারা আওড়ান, দেশের মানুষের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন এদের থেকেও। ▮

সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কিত গবেষণায় কে.ডি. শেঠনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

আধুনিক ভারতদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছিলেন তবুও সেই সব উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব তাঁর অনুগামী ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন একাধিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁরা

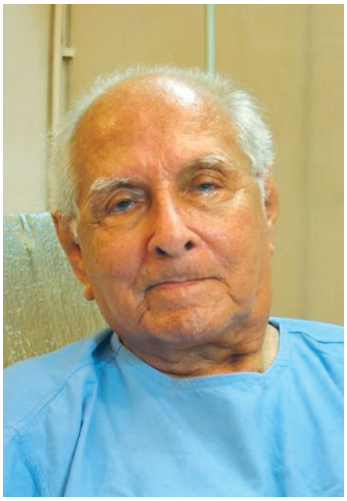

একাধারে কবি, যোগসাধক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক। এঁদের মধ্যেও বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী কে ডি শেঠনা। তিনি ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক দর্শন নিয়ে মনোনিবেশ করেছেন, আইনস্টাইনের পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন, শেক্সপিয়ারের রহস্যময়ী অন্ধকার নারীকে আবিষ্কার করেছেন, প্রচুর কবিতা লিখেছেন, ইউরোপীয় সাহিত্য এবং একাত্ম যোগ সাধনা ও ইতিহাস চর্চার বিজ্ঞানকে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে যে গভীর অনুশীলন করেছেন সে বিষয়ে আমরা এখানে আলোকপাত করব।

কেউ কেউ দাবি করছেন যে তামিল ভাষা নাকি সংস্কৃতের চেয়েও প্রাচীন। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সিন্ধু সভ্যতা যদি আর্য সভ্যতার চেয়ে আগে হয় এবং সংস্কৃত ভাষা আর্য সভ্যতার প্রধান ভাষা হয় আর তামিল ভাষার পূর্বসূরি যদি সিন্ধু সভ্যতার ভাষা হয় যা নাকি হরপ্পান সভ্যতার লিপিতে পাওয়া গেছে তবে তো বলতেই হয় যে তামিল ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে প্রাচীন। কিন্তু এর পালটা উত্তরে বলতেই হয় যে এটা সম্পূর্ণ বিদেশি খ্রিস্টানদের স্বকপোলকল্পিত, মিথ্যা।

এই ব্যাপারেও শেঠনা ক্রান্তদর্শী

শ্রীঅরবিন্দের উপর নির্ভর করেছিলেন। পুসালকরের মতে আসুরবানিফলের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত সংস্কৃত 'সিন্ধু' ভারতের তুলোকে বোঝায়, তার থেকেই আরবি সাটিন, গ্রিক সিন্ডন আর হিব্রু সাডিন হয়েছে; এর থেকে বোঝা যায় যে হরপ্পা ও মেসোপটেমিয়ার ভিতরে ব্যবসাবাণিজ্য ছিল এবং হরপ্পা সংস্কৃতিতে আর্য উপাদান ছিল।

শেঠনা তাতে সন্তুষ্ট হননি। তাঁর যুক্তি সংস্কৃতে কার্পাস বলতে তুলোকে বোঝায়। সেই পণ্যই অ্যাসিরীয়, গ্রিক ও হিব্রুতে অন্য একটা নাম পেল কী করে? অ্যাসিরীয়তত্ত্ববিদ ক্র্যামার তাঁকে জানিয়েছেন যে অ্যাসিরীয় শব্দটি হচ্ছে 'সিন্টু', 'সিন্ধু' নয়। তার মানে পশমের জামাকাপড় এবং তার সঙ্গে ভারত বা ইন্দাসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ক্র্যামার একথাও মানেননি যে গ্রিক সিন্ডন বা হিব্রু সাডিনকে সিন্টু বা সিন্ডুর সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে। কাজেই যাকে মনে করা হয়েছিল হরপ্পান সংস্কৃতিতে আর্যত্বের ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ তাকে তিনি ভুল প্রতিপন্ন করলেন। তবে তাঁর তত্ত্বের ত্রুটি হলো সিন্ধু ও পঞ্জাবে ৪০০০-২০০০ খ্রিস্ট পূর্ব কালখণ্ডে বৈদিক আর্য সভ্যতার কোনো চিহ্ন ছিল না, অন্তত ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। তারপর যখন তা পাওয়া গেল তখন তা স্বীকৃতি পেল।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত 'স্বস্তিকা ডিজিটাল' বিভাগটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। www.eswastika.com ওয়েবসাইটে যেমন প্রতি সপ্তাহে স্বস্তিকা পাওয়া যেত সেটা যথারীতি চালু থাকবে।

—স্বঃ সঃ

(১) প্রাগৈতিহাসিক ভারতে তুলোর ব্যবহার নিয়ে অধ্যয়ন করে তিনি যা জানালেন তা হলো : ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতি হরপ্পার আগের। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতায় আর্য উপাদান আছে। একটা মোক্ষম যুক্তি প্রাচীনতম সূত্রগুলোতে তুলোর উল্লেখ আছে। যদি ঋগ্বেদীয় আর্যরাই তুলো-চাষকরা হরপ্পানদের পরে বিকশিত হয়ে থাকে তবে সমস্ত বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং প্রথম দিককার উপনিষদে কার্পাসের কথা উল্লেখ নেই কেন? ১৩৩০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিল্লির সন্নিকটে তুলো পাওয়া গেছে। এটা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তথাকথিত ঋগ্বেদীয় আর্যদের আক্রমণের অনেক পরে। তুলোর মতো একটা পণ্যকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ না করা প্রতিপন্ন করে যে তুলো-সম্পর্কে অবহিত হরপ্পার আগে বেদ ছিল।

(২) প্রাক্-আর্য ও আর্যদের বিকাশস্থলে কুমোরদের মাটির পাত্রের গায়ে যে সব চিহ্ন আছে তাতে সিন্ধুসভ্যতার লিপির সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সুমেরীয় নথির মুলুক বলতে হরপ্পাকে বোঝায় আর বাইবেল উল্লিখিত অফির হচ্ছে সোপর জেলা।

(৩) এর পরে দেখা যাচ্ছে ঘোড়া ও স্পোক যুক্ত চাকার কথা আছে হরপ্পা সংস্কৃতিতে। কয়েকটা হরপ্পা মোহরে একটা বৃত্তের মাঝখানে ছ'টা ব্যাসার্ধ পাওয়া গেছে। সেসব কিন্তু সুমেরীয় ফলক বা মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফিক্সে (যা আসলে সূর্যের প্রতীকী), তাতে পাওয়া যায় না। চাকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা রথের কথা প্রমাণ করে। লোথালে একটা ভাঙা মাটির পাত্রে এক চিত্র আছে, তাতে দুই চাকার উপর দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ যা অ্যাসিরীয় রথারুঢ় কোনো মানুষের সঙ্গে মেলে, এটা একটা অকাট্য প্রমাণ।

(৪) এর থেকেও মোক্ষম প্রমাণ হচ্ছে এই মোহরের সি ১৪ কার্বন ডেটিং তারিখ-১৯৬০। খ্রিস্টপূর্ব, যা নাকি ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে ঘটা তথাকথিত আর্য আক্রমণের অনেক আগেকার। ফিনল্যান্ডের গবেষক পার্পোলা বলেছেন হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়ার হাড়ের কোনো চিহ্ন নেই। অথচ রণগুন্ডাইয়ে প্রাক-হরপ্পা যুগের ঘোড়ার দাঁতের চিহ্ন পাওয়া গেছে সেটা ২০০০ খ্রিস্টপূর্বের অনেক আগে। অন্যদিক থেকে হরপ্পা-পরবর্তী যুগের পঞ্জাব ও হরিয়ানার ঐতিহাসিক স্থলগুলোতে ঘোড়ার অস্তিত্বের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলেনি; যদি ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে আর্যরাই ঘোড়া ও ঋগ্বেদ সঙ্গে নিয়ে আসত তবে একদম নিশ্চিতভাবে তা থাকত এবং সেটাই হতো অকাট্য প্রমাণ যে আর্যরা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে হরপ্পার সভ্যতাকে ধ্বংস করে ভারতে ঢুকেছিল। অথচ ঘোড়ার হাড় মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা দুই জায়গাতেই মিলেছে।

জি আর শর্মা ১৯৮০ সালে প্রতিবেদনে বলেছেন যে বেলান ও শোন উপত্যকায় খননকার্য করে নব্যপ্রস্তর যুগের কোল্ডিহোয়া ও মহগোরা স্থলগুলোতে গৃহপালিত ও বুনো ঘোড়ার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, সেটা খ্রিস্টপূর্ব ৮০৮০ থেকে ৫৫৪০ পর্যন্ত কালপর্বে। ১৯৯০ সালে কর্ণাটকের হাল্লুরে পুনঃপুন খননকার্য করে, তথাকথিত আর্য আক্রমণের পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০-১৫০০-র মধ্যে, ঘোড়ার হাড়ের প্রমাণ মিলেছে। শ্রী আলুর বলেছেন যে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাতে গৃহপালিত গাধার পায়ের হাড়ের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সুতরাং পার্পোলা যে বলছেন আর্যরা ১৬০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বে ভারতে অভিগমন করেছিল তারা মানে আর্যরা নিশ্চয় তাদের আগমনের কয়েক শতক আগে দাক্ষিণাত্যে ঘোড়ার প্রচলন করতে পারতেন না। শেঠনা এইরকম একজন আর্য-আক্রমণতত্ত্ববাদী মাটিমার হুইলারকে উল্লেখ করে তাকেই খণ্ডন করেছেন, 'এটা খুব সম্ভব যে উট, ঘোড়া ও গাধা বস্তুত সিন্ধু বাণিজ্যদলের পরিচিত বৈশিষ্ট্য ছিল'। সুতরাং মোহরের উপরে ঘোড়ার চিহ্ন ছিল না এই যুক্তি খাড়া করে একথা বলা যায় না যে সিন্ধু সভ্যতায় তার অস্তিত্ব ছিল না। বিশেষত যখন ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ আক্রমণকারী আর্যদের দ্বারা ঘোড়া নিয়ে আসার অনেক আগেই ঘোড়ার অস্তিত্ব মিলেছে। যদি ঘোড়াই আর্য অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হয় তা হলে বলতেই হয় যে আর্যরা ভারতে ছিল হরপ্পা সভ্যতার অনেক আগে থেকেই। হরপ্পার নগর সভ্যতার স্থল বালু থেকে যখন একটা পোড়ামাটির গায়ে ঘোড়ার মতো কোনো প্রাণীর চিত্র পাওয়া গেছে, সেই ঘোড়ার উপরে আবার বসার জায়গাও আছে তখন একথা মানতেই হয়। ঋগ্বেদের সময়ে রথ শুধু ঘোড়াতেই টানত না। সুসাতে একটা বলদে টানা রথও মিলেছে সেটা এখনকার বালুচিস্তানের কুল্লিতে আছে। সুতরাং ঘোড়াও আছে রথও আছে অতএব ঘোড়ায় টানা রথও সেই সময় হরপ্পার অনেক আগে ছিল এটা প্রমাণিত হয়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক বাঙ্গালি পণ্ডিত, কেন্দ্রে মন্ত্রীও ছিলেন বোধ হয়। তিনি ইন্দ্রকেই হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের জন্য দায়ী করেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে হরপ্পা বসতিগুলোতে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। শুধু মহেঞ্জোদাড়োতে পাঁচবার বিপুল বন্যার খবর মিলেছে, এক একটা কয়েক দশক ধরে চলেছিল এমনকী এক শতক ধরেও। এই সাক্ষ্যপ্রমাণে মিলেছে যে আরব সাগরে উপকূল রেখা বরাবর সমুদ্রতল অনেকটা উঠেছিল। সুতরাং কাল্পনিক বাঁধ ধ্বংস করার জন্য আক্রমণকারী আর্যদের কোনো দরকারই ছিল না, সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগই দায়ী। দেবীবাবু আর একটা ভুল করেছেন, ইন্দ্র যেসব অস্ত্র ব্যবহার করতেন বলে মন্ত্রে বলা আছে সেগুলো সবই প্রতীকী। সুতরাং বস্তুগত পদার্থ যা তিনি নষ্ট করেছিলেন তাও ছিল প্রতীকী। প্রথমত ঋগ্বেদ শুধু শত্রুদের জন্য দুর্গ দেয়নি সেখানে আর্যদেরও দিয়েছেন। এবং এই দুর্গগুলো ওই সময়ের দুর্গগুলোকে গুণমানে অনেক বিশালতর অর্থাৎ ইন্দ্রের দুর্গগুলো প্রতীকি। (৯৯ বা ১০০টা পাথর বা ধাতুর তৈরি দুর্গ প্রত্নবিদরা পেয়েছেন।)

দ্বিতীয়ত, আক্রমণ যদি উত্তর থেকে হয় তাহলে উত্তরের বসতিগুলো বাদ দিয়ে দক্ষিণের মহেঞ্জোদাড়োতেই কেন আক্রমণ হলো? তখন তো তার এমনিই অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আরও কথা হলো এই যে এর ধ্বংসস্তূপের উপরে কোনো বসতি নেই কেন যদি আর্যরা তা ধ্বংসই করে থাকবে? □

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১০।।

মাধবরাও ছাত্রদের মনে ভালো সংস্কারের বীজ বপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই ছাত্ররা তাঁকে গুরুজী বলে সম্বোধন করত।

ভাইয়াজী দানী সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন। সঙ্ঘকাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি পড়াশোনা করার সময় পাচ্ছিলেন না।

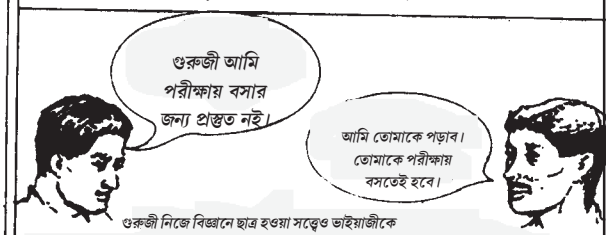

গুরুজী নিজে বিজ্ঞানে ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ভাইয়াজীকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো শুরু করলেন।

১৯২৮ সালে শ্রীমদন মোহন মালব্যের উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরেই সঙ্ঘের শাখা শুরু হলো। ভাইয়াজীর অনুরোধে গুরুজী শাখায় মাঝে মাঝে যেতেন। একবার তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সারনাথে বনভোজন করতে গেলেন।

গুরুজী স্বয়ংসেবকদের সারনাথের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন।

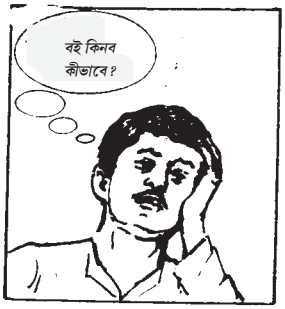

গুরুজী ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। যার ফলে মাঝে মাঝে হাতে একেবারেই টাকা থাকত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সাহায্য করতেন।

সেইসময় নকল বন্দুক ও তলোয়ারের সাহায্যে সঙ্ঘের শাখায় স্বয়ংসেবকদের মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হত।